আরও ভূতের গল্প

বিভিন্ন সাহিত্যিকের
শ্রেষ্ঠ ভূতের গল্পের সংকলন

[redacted] গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০৯

সম্পাদনা ঃ

সুজিতকুমার নাগ

প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৩৫

প্রকাশক ঃ

পি. সাহা

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রচ্ছদ-চিত্র ঃ

গৌতম রায়

মুদ্রা[redacted]

শ্রীমদন[redacted]

শ্রীদামো[redacted]

৫২এ, কৈলাস বসু [redacted]

কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূতের গল্প

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

আমি ভূতের গল্প বড় ভালবাসি। তোমরা পাঁচ জন মিলিয়া ভূতের গল্প কর, সেখানে পাঁচ ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে পারি। ইহাতে যে কি মজা, একটা শুনিলে আর একটা শুনিতে ইচ্ছা করে। গল্প শেষ হইয়া গেলে একাকী ঘরের বাহিরে যাইতে ইচ্ছা হয় না। তোমাদের মধ্যে আমার মতন কেহ আছ কিনা জানি না, বোধ হয় আছ। তাই আজ তোমাদের কাছে একটা গল্প বলিব। গল্পটা একখানি ইংরাজী কাগজে পড়িয়াছি। তোমাদের সুবিধার জন্য ইংরাজি নাম গুলি বদল করিয়া দিতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু গল্পটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবে যে শুধু নাম বদলাইলে চলিবে না। সুতরাং ঠিক যেরূপ পড়িয়াছি প্রায় সেইরূপ অনুবাদ করিয়া দেওয়াই ভাল বোধ হইতেছে।

স্কট্‌লনের ম্যাপটার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলে বাঁ ধারে ছোট ছোট দ্বীপ দেখিতে পাইবে। তাহার উপরেরটির নাম নর্থ উইষ্ট্‌, নীচেরটির নাম সাউথ উইষ্ট্‌। এর মাঝামাঝি ছোট-ছোট আরও কতকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এ সেকালের কথা, তখন ষ্টীম এঞ্জিনও ছিল না, টেলিগ্রাফও ছিল না; আমার ঠাকুরদাদা তখন এর একটি দ্বীপে স্কুলে মাস্টারি করিতেন।

সেখানে লোক বড় বেশি ছিল না। তাদের কাজের মধ্যে কেবল-মাত্র মেষ চরান, আর কষ্টে স্পষ্টে কোন মতে দিন চলার মত কিছু শস্য উৎপাদন করা। সেখানকার মাটি বড় খারাপ, তারি একটু একটু সকলে ভাগ করিয়া নেয় আর জমিদারকে খাজনা দেয়। ....এরা বেশ

সাহসী লোক ছিল! আর ঐ রকম কষ্টে থাকিয়া এবং সামান্য খাইয়াও বেশ একপ্রকার সুখে স্বাচ্ছন্দে কাল কাটাইত।

এই দ্বীপে এল্যান ক্যামেরন নামে একজন লোক ছিলেন। তাঁহার বাড়ি গাঁ থেকে প্রায় একমাইল দূরে। এল্যানের সঙ্গে মাষ্টারমশায়ের বড় ভাব, তাঁর কাছে তিনি কত রকমের মজার গল্প করিতেন। হঠাৎ একদিন ক্যামেরন বড় পীড়িত হইলেন, আর কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার কেউ আপনার লোক ছিল না, সুতরাং তাঁহার সমস্ত বিষয় বিক্রয় হইয়া গেল। তাঁহার বাড়িটা কেহই কিনিতে চাহিল না বলিয়া তাহা অমনি খালি পড়িয়া রহিল।

এর কয়েক মাস পরে একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে ডনাল্ড ম্যাকলীন বলিয়া একটি রাখাল ঐ বাড়ির পাশ দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ জানালার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল, আর সে ঘরের ভিতরে এল্যান ক্যামেরনের ছায়া দেখিতে পাইল। দেখিয়াই তো তার চক্ষু স্থির! সেখানেই সে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চুলগুলি খ্যাংরা কাঠির মত সোজা হইয়া উঠিল, ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল, গলা শুকাইয়া গেল।

শীঘ্রই তাহার চৈতন্য হইল। ঐরকম ভয়ানক পদার্থের সঙ্গে কাহারই বা জানাশুনা করিবার ইচ্ছা থাকে? সে তো মার দৌড়! একেবারে মাষ্টারমহাশায়ের বাড়িতে! তাঁহার কাছে সব কথা সে বলিল। মাষ্টারমহাশয় এ-সব মানেন না। তিনি তাহাকে প্রথম ঠাট্টা করিলেন, তারপরে বলিলেন, তাহার মাথায় কিঞ্চিৎ গোলযোগ ঘটিয়াছে। আরো অনেক কথা বলিলেন, বলিয়া যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন যে, ঐরূপ কিছুতে বিশ্বাস থাকা নিতান্ত মূর্খামি।

ডনাল্ড্ কিছুই বুঝিল না, সে অপেক্ষাকৃত সহজ বুদ্ধি বিশিষ্ট অন্যান্য লোকের কাছে তাহার গল্পটি বলিল। শীঘ্রই ঐ দ্বীপের সকলেই এই গল্প জানিতে পারিল। ঐ সব বিষয় মীমাংসা করিতে

বৃদ্ধরাই ওস্তাদ; তাঁহারা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে ইহাতে কত কুলক্ষণই দেখিতে পাইলেন।

ঐ দ্বীপের মধ্যে কেবলমাত্র মাষ্টারমহাশয়ের কাছেই খবরের কাগজ আসিত। মাসের মধ্যে একবার করিয়া কাগজ আসিত আর সেদিন সকলে মাষ্টারমহাশয়ের বাড়িতে গিয়া নতুন খবর শুনিয়া আসিত। সেদিন তাহাদের পক্ষে একটা খুব আনন্দের দিন। রান্নাঘরে বড় আগুন করিয়া দশ-বারজন তাহার চারিদিকে সন্ধ্যার সময় বসিয়া কাগজের বিজ্ঞাপন হইতে আরম্ভ করিয়া অমুক কর্তৃক অমুক যন্ত্রে মুদ্রিত হইল ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের তদারক ও তর্কবিতর্ক করিত। শেষের কথাগুলি সকলেরই একপ্রকার মুখস্থ হইয়াছিল, এবং পড়া শেষ হইলে ঐ কথাটা প্রায়ই সকলে একসঙ্গে একবার বলিত।

এই সকল সভায় রাখাল, কৃষক, গির্জার ছোট পাদরি প্রভৃতি অনেকেই আসিতেন। গ্রামের মুচি ররীও আসিত। ররী ভয়ানক নাছোড়বান্দা লোক, একটা কথা উঠিলে তাহাকে একবার আচ্ছা করিয়া না ঘাঁটিয়া সহজে ছাড়িবে না।

ডনাল্ড্ ম্যাকলীনের ঐ ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন সকলে এইরূপ সভা করিয়া বসিয়াছে, মাষ্টারমহাশয় চেঁচাইয়া তর্জমা করিতেছেন, এমন সময় একজন আসিয়া বলিল যে, এল্যান্ ক্যামেরনের ছায়া আবার দেখা গিয়াছে। এবারে একজন স্ত্রীলোক দেখিয়াছে। ঐ রাখাল যে স্থানে যে ভাবে উহাকে দেখিয়াছিল সেও ঠিক সেইরকম দেখিয়াছে।

এরপর আর পড়া চলে কি করিয়া! মাষ্টারমহাশয় চটিয়া গেলেন এবং ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। ররী তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিল। ররী কোন কথাই ঠিক মানে না; এবারেও মাষ্টারমহাশয়ের কথাগুলি মানিতে পারিল না। প্রচণ্ড তর্ক উপস্থিত। ভূতের কথা লইয়া সাধারণভাবে এবং ক্যামেরনের ভূতের বিষয় বিশেষভাবে প্রচার চলিতে লাগিল: আর সকলে বেশ মজা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু

ররীর মেজাজ গরম হইয়া উঠিল ; সে বলিল—‘দেখ মাষ্টারের পো, যতই কেন বলনা, আমি এক জোড়া নতুন বুট হারব, তোমার সাধ্যি নেই আজ দুপুর-রাতে ওখানে গিয়ে দেখে এস।’

সকলে করতালি দিয়া উঠিল। মাষ্টারমহাশয় হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাইলেন, কিন্তু ররী ছাড়িবে কেন ? সে সকলের উপর বিচারেব ভাব দিল। তাহারা এই মত দিল যে, মাষ্টারমহাশয় যখন গল্পগুলি মানিতেছেন না, সে স্থলে তাঁহার উচিত যে নিজেব পক্ষে তিনি যে মানেন না তা প্রমাণ করিয়া দেওয়া।

মাষ্টারমহাশয় দেখিলেন, অস্বীকাব করিলে যশেব হানি হয়। তিনি বলিলেন, ‘যাব বইকি ? কিন্তু আমি গিয়ে ফিবে এলেও এব চাইতে তোমাদের আর জ্ঞান বাড়বে না।’

ররী বলিল, ‘আচ্ছা দেখা যাউক।’

মাষ্টারমহাশয় বলিলেন, ‘ভাল, ওখানে গিয়ে আমি কি কবব ?’

ররী বলিল, ‘ওখানে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনবার বলবে, এল্যান ক্যামেরন আছ গো ? কোন জবাব না পাও ফিবে এস, আমি আর ভূত মানব না।’

মাষ্টারমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, ‘এটা ঠিক জেনো যে, এল্যান সেখানে থাকলে আমার কথার উত্তর দিবেই। আমাদের বড় ভাব ছিল।’

একজন বলিল, ‘তাকে যদি দেখতে পাও তা হলে মুচির কাছে ও যে টাকা পেত, সে কথাটা ভুল না।’ এ কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল, ররী একটু অপ্রস্তুত হইল।

এইরূপে হাসি-তামাসা চলিতে লাগিল, ক্রমে মাষ্টারমহাশয়ের যাবার সময় হইয়া আসিল।

শেষে মুচি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, ‘বারটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি, তুমি এখন গেলে ভাল হয়, তাহলেই ঠিক সময়মত পৌছতে পারবে।’

বেশ করিয়া কাপড়-চোপড় জড়াইয়া, মাষ্টারমহাশয় যষ্টি-হস্তে সেই বাড়ির দিকে চলিলেন। মাষ্টারের যাইবার সময় দু-একজন খোঁচা দিয়া দিল এবং স্থির করিল, ফলটা কি হয় দেখিয়া যাইবে।

রাত্রি অন্ধকার। এতক্ষণ বেশ জ্যোৎস্না ছিল, কিন্তু এক্ষণে কাল কাল মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। মাষ্টার চলিয়া গেলে সকলে বলাবলি আরম্ভ করিল যে সমস্ত রাস্তাটা সাহস করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব কি না। ছোট পাদরি বলিল যে তিনি হয়ত অর্ধেক পথ গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া যাহা ইচ্ছা বলিবেন, তখন আর কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না। ইহা শুনিয়া মুচির মনে ভয় হইল, জুতা জোড়াটা নেহাত ফাঁকি দিয়া নেয়, এটা তাহার ভাল লাগিল না। তখন একজন প্রস্তাব করিল যে, ররী যাইয়া দেখিয়া আসুক।

প্রথমে ররী ইহাতে আপত্তি করিল। কিন্তু উহার বক্তৃতার পরে রাজি হইল। সকলে তাহাকে সাবধান করিয়া দিল যেন মাষ্টার তাহাকে দেখিতে না পায়, তারপর সে বাহির হইল। খুব চলিতে পারিত, এই গুণে শীঘ্রই সে মাষ্টারকে দেখিতে পাইল। ররী একটু দূরে দূরে থাকিতে লাগিল—রাস্তাটা একটা জলা জায়গার মধ্য দিয়া গিয়াছে, একটিও গাছপালা নাই যে মাষ্টার ফিরিয়া চাহিলে তাহার আড়ালে থাকিয়া বাঁচিবে।

পরে মাস্টারমহাশয় যখন ঐ বাড়িতে পৌঁছিলেন তখন ররী একটু বুদ্ধি খাটাইয়া খানিকটা ঘুরিয়া বাড়ির সম্মুখে আসিয়া সেখানে একটা নিচু বেড়া ছিল, তাহার আড়ালে শুইয়া পড়িল।

সে অবস্থায় দূতের কার্য করিতে যাইয়া তাহার অন্তরটা গুর্ গুর্ করিতে লাগিল। মাস্টারমহাশয় ছিলেন বলিয়া, নহিলে সে এতক্ষণ চেঁচাইয়া ফেলিত। কষ্টেসৃষ্টে কোন মতে প্রাণটা হাতে করিয়া দেখিতেছে কি হয়। মনে করিয়াছে মাস্টারমহাশয় যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখা হইয়া গেলেই সে বাহির হইবে।

গ্রামের গির্জার ঘড়িতে বারটা বাজিল। সে বেড়ার ছিদ্র দিয়া

চাহিয়া দেখিল যে মাস্টারমহাশয় নির্ভয়ে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

মাস্টারমহাশয় গলা পরিষ্কার করিলেন এবং একটু শুষ্ক স্বরে বলিলেন—'এল্যান ক্যামেরন আছ গো ?'—কোন উত্তর নেই।

দু-এক পা পশ্চাৎ সরিয়া একটু আস্তে আবার বলিলেন 'এল্যান ক্যামেরন আছ গো ?'—কোন উত্তর নেই।

তারপর বাড়িতে আসিবার রাস্তাটির মাথা পর্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া থতমত স্বরে অর্ধ চিৎকার অর্ধ আহ্বানের মত করিয়া ভূতীয়বার বলিলেন 'এল্যান—ক্যামেরন—আছ—।' তারপর আর উত্তরের অপেক্ষা নাই—। সটান চম্পট।

কি সর্বনাশ! কোথায় মাস্টারের সঙ্গে বাড়ি যাইবে, মাস্টার এ কি করিয়া ফেলিলেন। মুচি বেচারীর আর আতঙ্কের সীমা নাই। ওই বুঝি ভূত এল্যান! আর থাকিতে পারিল না। এই সময়ে তাহার মনে যে ভয় হইয়াছিল সেই ভয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে সে মাস্টারের পিছনে ছুটিতে লাগিল।

সেই ভয়ানক চিৎকারের শব্দ মাস্টারমহাশয়ের কানে গেল। মুচি দৌড়াইতেছে আর ডাকিতেছে 'দাঁড়াও গো! মাস্টারমশাই! দাঁড়াও!' মাস্টারমহাশয় শুনিতে পাইলেন। পশ্চাতে একপ্রকার ফিরিয়াও তাকাইলেন। আর কি ? ঐ এল্যান ক্যামেরন! ভয়ে আরো দশগুণ দৌড়াইতে লাগিলেন। ররী বেচারী দেখিল বড় বিপদ! মাষ্টার বুঝি তাকে ফেলিয়াই গেল! কি করে, তাহারও প্রাণপণ চেষ্টা। মাস্টারমশাই দেখিলেন পিছনের লোকটা আসিয়া তাহাকে প্রায় ধরিয়াই ফেলিল। তাঁহার গায়ের বল চালিয়ে যাইতে লাগিলেন।

অবশেষে মাস্টারমহাশয় যখন দেখিলেন যে আর রক্ষা নাই, তখন তিনি সাহসে ভর করিলেন এবং খুব শক্ত করিয়া লাঠি ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতের দিকে ফিরিলেন এবং আর মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া গায়ে যত জোর ছিল তত জোরে ভূতের মস্তকে 'সপাট' করিয়া

সাংঘাতিক এক ঘা বসাইয়া দিলেন। তারপর সেটাও যেন কোথায় অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

ভূতটা যাওয়াতে এখন একটু সাহস আসিল, কিন্তু তথাপি যতক্ষণ গ্রামের আলো না দেখা গেল ততক্ষণ থামিলেন না। গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্বে সাবধানে ঘাম মুছিয়া ঠাণ্ডা হইয়া লইলেন। মনটা যখন নির্ভর হইল তখন ঘরে গেলেন—যেন বিশেষ একটা কিছু হয় নাই। অনেক কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি সবগুলিরই উত্তরে বলিলেন—

'ঐ আমি যা বলেছিলাম ভূত-টুত কিছুই তো দেখতে পেলাম না।'

এরপর মুচির জন্য সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মাস্টারকে তাহারা বলিল যে সে স্থানান্তরে গিয়াছে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।

আধ ঘণ্টা হইয়া গেল তবু মুচি আসে না। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। চিন্তা বাড়িতে লাগিল, ক্রমে একটা বাজিল। তারপব তাহারা আর থাকিতে পারিল না, মুচির অনুপস্থিতির কারণ তাহারা মাস্টারমহাশয়কে বলিয়া ফেলিল। মাস্টারমহাশয় শুনিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তিনি লাফাইয়া উঠিয়া লণ্ঠন হাতে করিয়া দৌড়িয়া বাহির হইলেন এবং সকলকে পশ্চাৎ আসিতে বলিলেন।

সকলের বিশ্বাস হইল মাস্টারের বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। হৈ-চৈ কাণ্ড! সকলেই জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারটা কি? তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া তাহারা মাস্টারকে দাঁড়াইতে বলিতে লাগিল। তাঁহাদের শব্দ শুনিয়া কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। কুকুরের গোলমালে গ্রামের লোক জাগিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ব্যাপারখানা কি?

এই সময়ে মাস্টারমহাশয় জলার মধ্য দিয়া দৌড়াইতেছে, আর মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে—কেবল পুলিশ—ম্যাজিস্ট্রেট—জুরী—ইত্যাদি ভয়ানক বিষয় মনে হইতেছে। তাঁহার লণ্ঠনের আলো দেখিয়া অন্যেরা তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছে।

সকলে তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহাকে ধরিল এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মাস্টারমহাশয়ের উত্তর দিবার পূর্বেই সেই মাঠের মধ্য হইতে গালি এবং গোঁঙ্গানিমিশ্রিত শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া দেখা গেল একটা লোক জলার ধারে বসিয়া আছে। লণ্ঠনের সাহায্যে নির্ধারিত হইল যে এ আর কেহ নহে, আমাদের সেই মুচি। সেইখানে বেচারা তুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া আছে আর তাহাদের মাস্টারের উদ্দেশে গালাগালি দিতেছে। তাহার নিকট হইতে সকলে সমস্ত ঘটনা শুনিল।

* * *

শেষে অনুসন্ধানে জানা গেল যে ঐ বাড়ির জানালার ঠিক সম্মুখে একটা ছোট গাছ। তাহারই ছায়া চাঁদের আলোতে দেয়ালে পড়িত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই ছায়ার আকৃতি দেখিতে ঠিক ক্যামেরনের মুখের মত। সেদিন চাঁদের আলো ছিল না বলিয়াই মাস্টারমহাশয় সেই ছায়া দেখিতে পান নাই।

আগন্তুক

হেমেন্দ্রকুমার রায়

আমাদের গ্রামখানি অনেকটা উপদ্বীপের মত। তার পূর্ব ও উত্তর দিক দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয়ে পশ্চিম দিকে আর একটি বড় নদীর ভিতর গিয়ে পড়েছে। পৃথিবীর মাটির সঙ্গে আমাদের গ্রামের অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে কেবল দক্ষিণ দিকে।

কিন্তু সে যোগটুকু না থাকলেও আমরা হয়তো দুঃখিত হতুম না। আমাদের গ্রামের উত্তর প্রান্তে নদীর কিনারায় যে শ্মশান আছে, এ অঞ্চলে তার চেয়ে বড় শ্মশান আর নেই এবং সেই শ্মশানে শবদাহ কববাব জন্যে দূর গ্রাম থেকেও লোক আসে ঐ দক্ষিণ দিক দিয়েই। এখানে যে শ্মশানেশ্বর মহাদেব বিরাজ করছেন, তিনি নাকি অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা—যদিও তিনি যে নিদ্রাগত না হয়ে অহরহই জাগ্রত হয়ে আছেন এমন কোন প্রমাণই আমরা পাই নি। কিন্তু অধিকাংশ লোক সেই কথাই বিশ্বাস করে, অতএব দেবতার মহিমায় এখানকার শ্মশানটি পরিণত হয়েছে মহাশ্মশানে। শবযাত্রীদের অস্বাভাবিক ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠ থেকে ঘন ঘন হরিবোল ধ্বনি উঠে আমাদের গ্রামের আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে তোলে যখন-তখন। দিনের বেলায় সেই সোরগোল কোনরকমে সহ্য করা যায়, কিন্তু নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে সে চীৎকার অমানুষিক হয়ে চতুর্দিকে সৃষ্টি করে কেমন একটা অসহনীয় অপার্থিব ভাব। ঘুমন্ত শিশুরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে জেগে কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। গ্রামখানি পুরোপুরি দ্বীপ হ'লে এ-সব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হ'ত না।

পল্লীগ্রামের মহাশ্মশানের ভয়াবহ বীভৎসতা কলকাতার বাসিন্দারা

ধারণায়ও আনতে পারবেন না। কলকাতার শ্মশানগুলোকে তো বাহির থেকে দেখায় সৌখিন মানুষদের বসতবাড়ীর মত। তাদের ভিতরটাও জীবন্ত জনতার আনাগোনায় ও কণ্ঠস্বরে সর্বদাই শব্দিত হয়ে থাকে, এমন কি সেখানে অমাবস্যা রাত্রির অন্ধতাও ঘুচিয়ে দেয় বহু ইলেক্‌ট্রিকের বাতি।

কিন্তু পল্লীগ্রামের মহাশ্মশান, বড় ভয়াবহ ঠাঁই! নিঝুম রাতে সেখানে পদার্পণ করলে সর্বাঙ্গে জাগ্রত হবে বিভীষিকার রোমাঞ্চ! হলুদবরণ চাঁদের পাণ্ডু আলো চারিদিকে প্রকাশ করে অস্পষ্টতার রহস্য এবং তারই সঙ্গে দুটো-একটা হারিকেন লণ্ঠন টিম্‌-টিম্‌ ক'রে জ্বলেও স্পষ্ট করে দেখাতে পারে না কোন কিছুই। বাতাসে বাতাসে জেগে ওঠে যেন মরন্ত রোগীর নাভিশ্বাস এবং তাই শুনে চতুর্দিক থেকে কালো কালো দানবের মত মস্ত মস্ত গাছপালাগুলো শিউরে শিউরে কেঁদে কেঁদে ওঠে সভয়ে এবং সশব্দে! এখানে-ওখানে ছাড়া ছাড়া হয়ে অপচ্ছায়ার মত নড়াচড়া করে যে-সব জ্যান্ত মানুষ, তাদের সংখ্যা এক হাতের আঙুলেই গুণে ফেলা যায়। একটা কি দুটো কিংবা বড় জোর তিনটে চিতা দূরে লক্‌লক্‌ ক'রে ওঠে ক্রুদ্ধ নরক-নাগিনীর জ্বলন্ত রক্ত-জিহ্বার মত। কোন বৃক্ষের অদৃশ্য শাখায় বসে অশুভ কণ্ঠে আচমকা চ্যাঁ-চ্যাঁ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে একাধিক প্যাঁচা। চমকে দেয় জীবন্তদের অন্তরাত্মাকে। স্থানে স্থানে রাশিকৃত ভাঙা কলসী ও মাংসহীন অস্থি প্রভৃতির সঙ্গে পড়ে থাকে কোন অগ্নিদগ্ধ মানুষের ভয়াল দেহাবশেষ—কারণ এখানে শহরের মত সব সময়ে মৃত দেহকে নিঃশেষে পুড়িয়ে ফেলা হয় না। দূরে আনাচে-কানাচে যেখানে চোখ যা-কিছু দেখে সব ছায়া-ছায়ার মত, সেখানে হয়তো মানুষের আধ-পোড়া দেহের অংশবিশেষ নিয়ে মারামারি, টানাটানি, ছেঁড়াছিঁড়ি করে শৃগাল-কুকুরের দল, বিশ্রী চীৎকারে বিষাক্ত করে চতুর্দিকে! তারও পরে আরো দূরে যেখানে যেতে নারাজ হয় মানুষের দৃষ্টি, মনে সন্দেহ জাগে, সেখানে হয়তো চলাফেরা করছে এমন মৃত

মানুষের জনতা, পার্থিব জগতে ঠাঁই না থাকলেও রাজি নয় যারা পৃথিবীর মাটি ত্যাগ করতে। বন্ধ হয়ে যায় জীবন্তদের পদচালনা, স্তম্ভিত হয়ে যায় চক্ষু, মন এবং দেহ। তারও উপরে থেকে থেকে মাথার উপর দিয়ে ডানা ঝট্‌পট্‌ করতে করতে উড়ে যায় নিশীথিনীর বৃহত্তর কালো প্রজাপতির মত অমঙ্গলকর ও নির্বাক বাদুড়ের দল। অভিধান শ্মশানের আর এক নাম দিয়েছে—'প্রেতভূমি'। এ নাম মিথ্যা নয়। পল্লীগ্রামের শ্মশান দেখলে প্রেতভূমি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

এমনি এক শ্মশান থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে আমরা বাস করি। আমাদের বাড়ী হচ্ছে গ্রামের শেষ বাড়ী। তারপর একটা ছোট মাঠ। তারপর একটা ছোট জঙ্গল। তারপরেই নদীর ধারে শ্মশান।

কৃষ্ণপক্ষের কালো রাতের জন্যে আসর ছেড়ে দিয়ে মিলিয়ে গেল সন্ধ্যার ঝাপ্‌সা আলো।

সেদিন কি বিষম গুমট! বাতাসের দম যেন একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, নড়ছে না গাছের পাতা পর্যন্ত। ঘরের ভিতর টেঁকা দায়। বাড়ীর বাইরের রোয়াকে এসে বসলুম এবং হাত পা ছড়িয়ে ভালো করে বসতে না বসতেই শুনলুম বহু কণ্ঠের চীৎকার—"বল হরি-হরিবোল! বল হরি, হরিবোল! বল হরি, হরিবোল!"

ঝিল্লীমুখর উত্তপ্ত অন্ধকার রাত্রে এই মৃত্যুধ্বনি মনের মধ্যে জাগিয়ে তুললে অশান্তি। একটু তফাতে, আমার বাড়ীর সামনে দিয়েই শ্মশানে যাবার রাস্তা। কিন্তু চারিদিকে এত অন্ধকার যে, শবযাত্রীদের কারুকেই দেখতে পেলুম না—কেবল শোনা যেতে লাগল হরিনামের সেই শব্দময় বিভীষিকা! ক্রমে তা ক্ষীণতর হয়ে একেবারে থেমে গেল। বুঝলুম শ্মশানে পৌঁচেছে শবযাত্রীরা।

শবযাত্রীদের কণ্ঠ মৌন হল বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে রাত্রের কতক-গুলি নিজস্ব ধ্বনি আছে। থেকে থেকে গাছের পাতাদের ফিস্‌-ফাস্‌; হঠাৎ জেগে ওঠা পাখীদের ডানা ঝাড়া, গাছের তলায় শুক্‌নো পাতাদের ভিতরে সড়্‌-সড়্‌ শব্দ তুলে হয়তো চলে যায় কোন সাপ বা

সরীসৃপ ; হয়তো ডেকে ওঠে কর্কশ স্বরে একটা কি দুটো তক্ষক ; কিংবা শোনা যায় শৃগাল-সভার স্বল্পস্থায়ী হট্টগোল ; এবং এই সবের উপরেও সর্বক্ষণ জেগে থাকে ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ ক'রে ঝিঁ-ঝিঁ পোকাদের একটানা আর্তনাদ !

বেশ খানিকক্ষণ ধরে একলা বসে বসে শুনলুম সেই রাত্রির ধ্বনি। তারপর চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে লাগল তন্দ্রার আমেজে। উঠি-উঠি করছি, হঠাৎ যেন অন্ধকার ফুঁড়েই একেবারে আমার সুমুখে এসে দাঁড়াল একটা সুদীর্ঘ ছায়ামূর্তি। এমন আচম্বিতে এত নিঃশব্দে তার আবির্ভাব, চমকে না উঠে পারলুম না।

শুধালুম, "কে ?"

অন্ধকারে দেখতে পেলুম, মূর্তির চোখদুটো চক্‌চক্ করে উঠল। সে অত্যন্ত গম্ভীর ও শুষ্কস্বরে বললে,—"ক্ষুধার্ত অতিথি।"

—"অতিথি ! এই রাত্রে ?"

—"ক্ষুধার্তের সময় অসময় নেই। কেবল ক্ষুধার্ত নই, আমি শীতার্তও। শীতে ঠক্‌-ঠক্ করে কাঁপছি। আগে বাড়ীর ভিতরে একটু আশ্রয় দিন—বাইরে আর দাঁড়াতে পারছি না।"

মহাবিস্ময়ে বলে উঠলুম, "বলেন কি মশাই, আপনার শীত করছে ? আর এদিকে দারুণ গুমটে সিদ্ধ হয়ে আমরা মারা যেতে বসেছি।"

সে যেন কাঁপতে কাঁপতে বললে, "বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথায়, তাহলে এই দেখুন ! কই, আপনার হাত কই ?"

আমার একখানা হাত বাড়িয়ে দিলুম। সেও হাত বাড়িয়ে ধরলে আমার হাতখানা। কিন্তু পর-মুহূর্তেই আমি শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি নিজের হাতখানা টেনে নিলুম ! উঃ, কি অসম্ভব ঠাণ্ডা তার হাত ! ঠিক যেন জমাট বরফ দিয়ে গড়া !

সে কাতরস্বরে বললে, "বাড়ীর ভিতরে চলুন, বাড়ীর ভিতরে চলুন ! আমি আর বাইরে দাঁড়াতে পারছি না !"

বাড়ীতে ঢুকে ভিতর থেকে সদর দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছি, হঠাৎ আকাশের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চিরে ফালা-ফালা করে দিয়ে দপ্‌দপিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলে উঠল একটি অতি দীর্ঘ বিদ্যুৎ-শিখা! তার পরেই বজ্রের গর্জন! ইতিমধ্যে অন্ধকার কখন্ যে গোটা আকাশটা ভ'রে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে মেঘের পর মেঘের দল সেটা একেবারেই আমার নজরে আসেনি। বোধহয় বৃষ্টি পড়তে আর দেরি নেই।

বৈঠকখানায় প্রবেশ ক'রে টেবিল্ ল্যাম্পটা উস্কে দিলুম। তারপর কৌতূহলী দৃষ্টি ফেললুম সেই ক্ষুধার্ত ও শীতার্ত অতিথিটির দিকে।

অদ্ভুত, তার সবই অদ্ভুত! যেমন ঢ্যাঙা, তেমনি রোগা তার দেহ, খালি গা, খালি পা, কোমরে জড়ানো একখানা নতুন কাপড়। দেহের কোথাও যেন মাংস নেই, কেবল চাদর দিয়ে ঢাকা আছে যেন হাড়গুলো! কুচ্‌কুচে কালো রং। মাথায় বড় বড় চুল—বিশৃঙ্খল। মুখের দুই পাশ চুপ্‌সে বসে গিয়েছে। শুকনো ঠোঁট দুখানা ঠেলে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে বাইরে—যেন মূর্তিমান দুর্ভিক্ষ! আর কী বুভুক্ষু দৃষ্টি!

জানিনা, বুকের কাছটা কেন ছম্-ছম্ করে উঠল! সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বাড়ীর বাইরে ঝড়ের চীৎকার।

থর্-থর্ করে কেঁপে উঠে আগন্তুক বললে, "উঃ। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। জান্‌লা বন্ধ করে দিন—জান্‌লা বন্ধ করে দিন!"

জানালাগুলো বন্ধ ক'রে ফিরে দাঁড়িয়ে বললুম, "মহাশয়ের কি কোনো ব্যামো-ট্যামো হয়েছিল?"

—"ব্যামো? হ্যাঁ, হয়েছিল বৈকি! শক্ত ব্যামো! সুবিধা পেয়ে শত্রুরা তাই আমাকে যমের বাড়ীতে পাঠাতে চেয়েছিল। তাই তো আমি তাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

—"শত্রু? শত্রু আবার কারা?"

—"জ্ঞাতিশত্রু, মশাই, জ্ঞাতিশত্রু। তাছাড়া আবার যমের বাড়ীতে পাঠাতে চাইবে কে?"

—"আপনার কথা আমি ভালো করে বুঝতে পারছি না। তারা কি আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল?"

—"বেশী কথা বলবার শক্তি আমার নেই। শুনছেন না, ঝড়ের সঙ্গে আবার বৃষ্টি নামল। পৃথিবী এখনি ভাসবে, শীত আরো বাড়বে। আমি শীতার্ত, আমি শীতার্ত। উঃ, কি ক্ষিদে পেয়েছে—আমি ক্ষুধার্ত! কিছু খেতে দিন মশাই, আগে কিছু খেতে দিন।"

বললুম, "এত রাত্রে বাড়ীর সকলেরই খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। তবু চেষ্টা করে দেখছি, একটু অপেক্ষা করুন। কিন্তু বেশী কিছু দিতে পারব বলে মনে হয় না!"

—"যা পারেন তাই দিন, যা পারেন তাই দিন। ওঃ, শত্রুরা না খাইয়ে মারবে বলে কতদিন আমাকে কিছু খেতে দেয় নি—কত দিন আমি উপোস করে আছি!"

বাড়ীর ভিতরে গিয়ে কোনরকমে সংগ্রহ করলুম কিছু ভাত, কিছু তরকারি, খানতিনেক রুটি, দুটি সন্দেশ, ও চারটি নারিকেল নাড়ু। থালার উপরে তাই সাজিয়ে নিয়ে ফিরে এলুম বৈঠকখানায়।

দেখলুম একদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগন্তুক যেন কান পেতে কি শুনছে। চোখ দেখলে মনে হয়, তার দৃষ্টি যেন ঘরের নিরেট দেওয়াল ভেদ ক'রে চলে গিয়েছে বাইরে, কত দূরে!

বললুম, "আপনার খাবার এনেছি।"

সে যেন আমার কথা শুনতেই পেল না।

আচম্কা ফিরে দাঁড়িয়ে ত্রস্তস্বরে সে বলে উঠল, "তারা আসছে, তারা আসছে!"

বিপুল বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কারা আসছে?"

—"আমার শত্রুরা! আমি তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি! আমি চললুম!"

—"সে কি, আপনার খাবার এনেছি যে?"

—"না, না, আমি আর খাব না, আর আমি ক্ষুধার্ত নাই! শত্রুরা আবার আমাকে যমের বাড়ীতে পাঠাবার জন্যে ছুটে আসছে! আমি পালাই—আমি পালাই।" বলতে বলতে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল উদ্‌ভ্রান্তের মত। তারপরেই দুম্ ক'রে সদর দরজটা খোলবার শব্দ হল!

হতভম্বের মত খাবারের থালা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, কে এই আশ্চর্য লোকটা? পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে আসেনি তো?

সদর দরজার কপাট দুখানা ঝোড়ো হাওয়ায় দুম্‌দাম্ করে একবার বন্ধ হচ্ছে, একবার খুলে যাচ্ছে। তখন পৃথিবীর আর সব শব্দ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ঝড়-বৃষ্টির দাপটে।

দরজাটা আবার বন্ধ করে দেবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছি, আচম্বিতে দেখি ছয়-সাতজন লোক সবেগে দৌড়ে এসে হুড়মুড় ক'রে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়ল।

হ্যারিকেন লণ্ঠনটা তুলে ধরে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কে?"

তাদের একজন বললে, "আমরা শ্মশান থেকে পালিয়ে আসছি!"

—"পালিয়ে আসছেন? কেন?"

—"এমন দুর্যোগে শ্মশানে কোন মানুষ তিষ্ঠোতে পারে? ছুটতে ছুটতে এই পর্যন্ত এসে আপনার বাড়ীর আলো দেখে এইখানেই ঢুকে পড়েছি।"

—"তাহ'লে আপনাদের শবদাহ শেষ হয়েছে?"

—"না মশাই, না। আমাদের কপাল আজ বড়ই মন্দ। শব শ্মশানে রেখে পাশের জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিলুম। কিন্তু ফিরে এসে দেখি, খাটের উপর থেকে মড়া অদৃশ্য হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার মশাই, আজব কাণ্ড!"

ফাঁসিগাছ

প্রমথনাথ বিশী

আমাদের গ্রাম থেকে রেল ষ্টেশনে পৌঁছবার পথের মাঝামাঝি জায়গায় একটা প্রকাণ্ড গাছ ছিল। গাছটি একটি বনস্পতি, যেমন বিশাল, তেমনি প্রাচীন; আর সেটা যে কি গাছ তার পরিচয় কেউ জানতো না। এদেশের উদ্ভিদের সঙ্গে তার গোত্রের মিল ছিল না। চারিদিকের বৃক্ষরাজির মধ্যে সেই বলিষ্ঠ, সমুন্নত, অজ্ঞাতকুলশীল বৃক্ষটি পাণ্ডব-সৈন্যসমাবেশের মধ্যে যেন ঘটোৎকচ। স্বভাবতঃই বৃক্ষটি দৃষ্টি আকর্ষণ করবাব মতো, কিন্তু তার আবও কারণ ছিল, সেটি ছিল একটি ফাঁসিগাছ। লোকে বলতো—নবাবী আমলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ফাঁসি দেবার জন্য গাছটি ব্যবহৃত হ'ত। কাছেই একটি গ্রামে থাকতো নবাবের ফৌজদার; প্রাণদণ্ড দেবার ক্ষমতা ছিল তার; কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'লে জল্লাদে লোকটাকে ঝুলিয়ে দিতো গাছটির একটি ডালে। মানুষ ঝুলিয়ে দেবার মতো ডালগুলোই বটে। গাছটির গুঁড়ি থেকে পঁচিশ-ত্রিশ হাতের মধ্যে কোন ডালপালা নেই, একেবারে পরিষ্কার গা, মসৃণ, তার উপরে ডাল বেরিয়েছে; এক-একটা ডাল কি লম্বা, একেবারে গ্রামান্তর গিয়ে যেন পৌঁছায়, এমনি থাকে থাকে সুবিন্যস্ত ডাল উঠে গিয়েছে; যত উঁচুতে উঠেছে ততই ডালের দৈর্ঘ্য কম; সবসুদ্ধ মিলে গাছটির উপরের দিকে ছুঁচালো—মন্দিরের আকৃতি। গাঁয়ে গোপাল বলে একজন বৃদ্ধ মুসলমান কৃষাণ ছিল, সে বলতো তার ঠাকুর্দা নাকি ঐ গাছে ফাঁসি দিতে দেখেছে, সেটাই ছিল নাকি ঐ গাছে শেষ ফাঁসি লটকানো।

গোপালের বয়স তখন ছিল নিরানব্বই ; গোপালের কথা সত্যি হ'লে তার ঠাকুর্দার সময় নবাবী আমলের শেষ পড়ে বটে ; আর তার মুখে এ গল্পটাও শুনেছি আমার বাল্যকালে ; কাজেই গোপালের নিরানব্বই-এর সঙ্গে আমার বয়েসের মোটা একটা অঙ্ক জুড়ে নেওয়া উচিত।

যাই হোক শেষ ফাঁসির বর্ণনা সত্য হোক আর নাই হোক, গাছটা যে ফাঁসিগাছ ছিল তা নিঃসন্দেহ। জেলা গেজেটিয়ার পুস্তকে ফৌজদার-অধ্যুষিত ঐ গ্রামটির উল্লেখ আছে, আরও উল্লেখ আছে যে কাছাকাছির গাছগুলোতে ফাঁসি দেওয়া হ'ত। তা যদি হয় এমন যোগ্য গাছটির ব্যবহার না হবার কথা নয়।

কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস যাক। যা বলতে বসেছি তা হচ্ছে ঐ ইতিহাসের স্মৃতি। সেদিনের বিষাক্ত স্মৃতি আজও গাছটিকে ভয়াবহ করে রেখেছিল। কেউ পারতপক্ষে রাতের বেলায় গাছটির কাছে যেত না, একা তো নয়ই। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে, না গিয়েও উপায় ছিল না, রেল ষ্টেশনে যাবার সড়কের ঠিক পাশেই তার অবস্থান। কত নিঃসঙ্গ পথিক যে রাতের বেলায় ওখানে এসে দব্‌কে মূর্ছা গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের প্রশ্ন করলে বলতো —কি দেখলাম ? তা কি এখন মনে আছে ? তবে মনে হ'ল গাছের ডালে সারি সারি যেন মৃতদেহ ঝুলছে !

আবার কেউ বা বলতো মুমূর্ষুর অন্তিম আর্তনাদ স্পষ্ট শুনেছে। একজন বলেছিল, সে লোকটা বিদেশী—গাছের ইতিহাস জানতো না, ঐ গাছতলায় পৌঁছুবামাত্র হঠাৎ একটা মৃতদেহ ধপ্‌ করে তার পায়ের কাছে পড়ল ; সে চমকে উপর দিকে তাকিয়ে দেখে যে গাছের ডালে লম্বা একটা দড়ি ঝুলছে। প্রশ্নের খোঁচা খেয়ে সে বলল যে, সেটা ছিল জ্যোৎস্না রাত্রি, তার ভুল দেখবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

তবে এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না যে এসব অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ হওয়া

সত্ত্বেও সত্য হ'তে পারে না। কেননা, ফাঁসি হ'ত বহুকাল আগে। তার সেদিনের স্মৃতি যদি কোন অলৌকিক সুড়ঙ্গ-পথে আজ মূর্তি ধরে দেখা দেয়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা ; যুক্তি দিয়ে প্রমাণ-অপ্রমাণ করার পথ বন্ধ।

কিন্তু যুক্তি এক আর বিশ্বাস আর। লোকের মনের ব্যাপক বিশ্বাসই এখন তথ্যের স্থান গ্রহণ করেছিল, আর তা-ই ছিল যথেষ্ট। ফলে, ঐ গাছটা যাতায়াতের পথের পাশে ভীতিমিশ্রিত একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়ের চিহ্নের মতো দণ্ডায়মান ছিল।

তারপর বয়েস বাড়লে কলকাতায় গেলাম কলেজে পড়তে। আমাদের মেসে একজন বয়স্ক ব্যক্তি থাকতেন, তাঁর থিওজফি চচার বাতিক ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁকে ফাঁসি-গাছটির বিবরণ শুনিয়ে ছিলাম। তিনি কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করে বললেন, এমন হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, যেখানে কোন মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে থাকে, সেখানে পববর্তীকালে সেই মৃত্যুদৃশ্যের ঠিক পুনরভিনয় মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। কেন এমন হয়, তিনি বললেন, তিনি জানেন না। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। মৃত্যুর সময় মানুষগুলো যে মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করেছিল, সেই নিদারুণ তাড়নাতেই ওখানে ঐ রকম অলৌকিক ছায়াছবি উদ্ভূত হয়ে থাকে বলে তিনি মনে করেন।

বলা বাহুল্য এ ব্যাখ্যা আমার মনঃপূত হ'ল না, কিন্তু ও নিয়ে আর তর্কবিতর্ক করি নি।

তারপর কর্মজীবনে প্রবেশ করলাম এবং চাকরি উপলক্ষে নিজের গ্রাম থেকে একপ্রকার নির্বাসিত হলাম। বহুকাল, জীবনের দুটি দশক কাটলো দেশ এবং দেশান্তরে। এই সময়ের মধ্যে স্বগ্রামে যাওয়ার সুবিধে হয়ে ওঠে নি। কালক্রমে গ্রামের ছবি মনে ঝাপসা হয়ে এল। রেল ষ্টেশনে নেমে গ্রামে যাওয়ার পথে যে-সব দৃশ্য, বাড়িঘর গাছপালা, এমন কি মানুষের যে মুখগুলো যাতায়াতের পথের

পাশে দেখতে পেতাম ক্রমে ক্রমে ভুলে গেলাম, সেই সঙ্গে ফাঁসিগাছটার স্মৃতিও মন থেকে মুছে গেল।

প্রায় কুড়ি বছর পরে গ্রামে চলেছি। সন্ধ্যাবেলায় নামলাম ষ্টেশনে, একখানা টমটম গাড়ি ভাড়া করলাম, বারো মাইল পথ পৌঁছতে এক প্রহর রাত হবে। পথে চলতে চলতে পুরাতন ছবিগুলো জন্মান্তরের স্মৃতির মতো মনে পড়তে লাগলো, মনে হ'ল যেন ধীরে ধীরে নিজের অতীতকালের মধ্যে প্রবেশ করেছি। রাত তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, মাঝামাঝি পথে এসে পড়েছি এমন সময়ে সেই ফাঁসিগাছটার কথা মনে পড়লো। ভয় হ'ল না, সঙ্গে তো গাড়িব গাড়োয়ান আছে, কৌতূহল হ'ল খুব। অভিনব কিছু দেখা যায় কিনা ভেবে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ করে নিয়ে স্থির হয়ে বসলাম। এবারে বোধ করি ফাঁসিগাছের কাছে এসে পড়েছি, রাস্তার বাঁ দিকে গাছটা। ঐ তো গাছটা। কি বিরাট! অন্ধকারের আলখাল্লা প'রে যেন এক অতিকায় পুরুষ। লোকে যে ভয় পাবে তা আশ্চর্য কি, আমারই সর্বাঙ্গ শিরশির করে উঠলো। নির্বিপাকে গাছগুলা অতিক্রম করে গেলাম। কিছুদূরে এসে গাড়োয়ান বলল, বাবু, এখান দিয়ে আগে রাতের বেলায় যাওয়া বড় কঠিন ছিল।

—কেন?

—ফাঁসিগাছটার ভয়ে।

কান খাড়া করে সজাগ হয়ে উঠলাম, শুধোলাম....এখন বুঝি সাহস বেড়েছে?

—সাহস বাড়তে যাবে কেন? ভয়ের ব্যাপার তো আর নেই।

—গাছটার ভূত ছেড়ে গিয়েছে বুঝি?

—গাছটাই যে গিয়েছে!

—কোথায় যাবে?

—আপনি বুঝি এ পথে অনেকদিন আসেন নি। তাই জানেন না।

—কি ব্যাপার বলো তো!

সে আরম্ভ করলো—বছর পাঁচেক আগে একবার বৈশাখী ঝড়ের সময়ে গাছটার মাথায় বাজ পড়ে আগাগোড়া পুড়ে গেল। একটা বাজে যে অত বড় একটা গাছকে পুড়িয়ে আঙার করে দিতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

—তারপর?

—তারপর সেই আঙার ঝড়ে-জলে ভেঙে পড়লো, ঝড়-ঝাপটায় কোথায় ছড়িয়ে গেল।

—এখন?

—এখন ও জায়গাটা একেবারে পরিষ্কার—যেমন দেখলেন।

যেমন দেখলাম!

নিজের মনে মনে বললাম—আমি তো বাপু গোটা গাছটাকেই দেখেছি! অথচ তার কথাও বিশ্বাস না করা শক্ত। লোকটা মিথ্যা বলতে যাবে কেন? এ মিথ্যা বলে তার লাভ কি? এখুনি তো অপরের মুখে প্রতিবাদ হবে।

যেমন দেখলুম। কি দেখলাম! কিন্তু নিজের জাগ্রত দৃষ্টিকেই বা অবিশ্বাস করি কিভাবে? নিশ্চয় দেখেছি তাতে কোন ভুল নেই। ভাবলাম, একবার ফিরে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি অনেকটা পথ এসেছে, তাছাড়া লোকটাই বা কি ভাববে!

তবে—কি দেখলাম? ছায়া না মায়া, না কি। কিন্তু কিছু যে তা নিশ্চয়। তখন মেসের সেই থিওজফিস্ট ভদ্রলোকের কথা মনে পড়লো। ভাবলাম, গাছের ডালে মৃত্যুদৃশ্যের পুনরভিনয় যদি সম্ভব হয়, তবে মৃত গাছটির পুনরভিনয়ই বা কেন অসম্ভব? তা-ই কি! আমার অভিজ্ঞতা কে বিশ্বাস করবে?

লোকটার কথা মনে পড়লো—"যেমন দেখলেন!" যেমন দেখলাম! কি দেখলাম মনের মধ্যে ক্রমাগত আলোড়ন করতে লাগলো, আর তার সঙ্গে তাল রেখে গাড়িখানা অন্ধকার পল্লীপথ দিয়ে এগিয়ে চলল—গ্রামের দিকে।

●

আকস্মিক

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কথা হচ্ছিল আমাদের এক বন্ধু বিভূতিকে নিয়েই।

প্রায় দশ-বার দিন আমাদের আড্ডায় সে অনুপস্থিত। কোন খবর পর্যন্ত নেই। অথচ দলের মধ্যে সে-ই বেশী আড্ডাবাজ। রোজকার মত আমরা আমাদের ক্লাব-ঘরে এসে সেদিনও সন্ধ্যায় জমায়েত হয়েছি এবং কখন যে আকাশ ভেঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে টেরও পাইনি। খেয়াল হলো রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ। এবারে বাড়ি ফেরা দরকার কিন্তু দরজা খুলতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে সঙ্গে সঙ্গে আবার দরজাটা তখুনি বন্ধ করে দিতে হলো।

ঝম্ ঝম্ করে তখনও বৃষ্টি ঝরছে এবং বৃষ্টি ছাটের ঘন কুয়াশায় চার-দিক একাকার। সমস্ত গলিটা জলে ডুবে গিয়েছে,ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত জল থৈ থৈ করছে। সঙ্গে কারো একটা ছাতা বা ওয়াটারপ্রুফ কিছুই নেই অথচ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে স্নান করে যেতে হবে।

তাই সকলে আবার জাঁকিয়ে বসলাম।

মহীন বললে,—বেরুনোই যখন যাবে না তখন ভূতের গল্প শোনা যাক। সরোজ, বল একটা জমাটি ভূতের গল্প।

আমাদের মধ্যে বন্ধু সরোজই সাহিত্যিক। শুধু সে সাহিত্যিকই নয়, চমৎকার গল্প বলবারও তার একটা ক্ষমতা আছে। কিন্তু মহীনের প্রস্তাবে বাধা দিলে দিব্যেন্দু, বললে—না, শচীনের নতুন কোন ম্যাজিক দেখা যাক।

আমি প্রস্তাবে এবারে সায় দিলাম—হ্যাঁ, সেই ভাল। শচীন শুরু কর।

আমাদের দলের মধ্যে শচীন এ্যামেচার ম্যাজিসিয়ান না হলেও ম্যাজিকে সত্যিই তার বাহাদুরি ছিল। আশ্চর্য রকমের ম্যাজিক এক এক সময় আমাদের দেখিয়ে সে কতদিন তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে বসে শচীন আপনমনে একটা সিগ্রেট টানছিল, আমার প্রস্তাবে সে বললে,—ম্যাজিক যে দেখাবো তা জিনিসপত্র কোথায়?

ঠাট্টা করে সরোজ বললে,—জিনিসপত্র না হলে ম্যাজিক দেখাতে পারবি না, তবে কিসের ছাই তোর ম্যাজিক!

—ঠিক আছে। শুধু হাতেই দেখাবো।

সকলে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

—ঘরের আলোটা নিবিয়ে দে—শচীন বললে। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে একটা ক্যাণ্ডেল জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখ।

শচীনের কথামত তাই করা হলো। একটা মাত্র ক্যাণ্ডেলের আলো ঘরের মধ্যে অদ্ভুত আলোছায়া সৃষ্টি করেছে। আলোর শিখার একটা ছায়া সেই আধো-আলো, আধো-আঁধারে দেওয়ালের গায়ে কাঁপছে। বাইরে সমানে পড়ছে বৃষ্টি। শচীন তার পূর্বের আসনেই বসা। আমরা বার'জন ঘরের একদিকে গা ঘেঁষাঘেষি করে বসেছি।

—কিরে, কই শুরু কর তোর ম্যাজিক—সরোজ বললে।

—চুপ কর। কথা বলিস না!—ভারি গলায় বললে শচীন।

তারপর সবাই চুপচাপ। এক মিনিট, দু'মিনিট করে প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। সবাই অধৈর্য হয়ে উঠেছে!

এমন সময় সরোজ আবার প্রশ্ন করলে,—কি রে শচে, ঘুমালি নাকি বাবা?

—চুপ—দরজাটা খুলে দে, কে এসেছে দেখ—শচীন বললে।

সত্যিই! জলের ছপ্ ছপ্ একটা শব্দ সকলেই আমরা শুনতে পেলাম। শব্দটা ক্রমে এগিয়ে এসে বন্ধ দরজার কাছেই থামলো।

তারপর দরজার গায়ে শব্দ উঠলো—টুক্ টুক্।

—কে !

আবার শব্দ টুক্ টুক্। আমিই উঠে গিয়ে দরজাটা খুললাম। সঙ্গে সঙ্গে একবার বিদ্যুৎ চমকালো। সেই ক্ষণিক আলোর দীপ্তিতে দেখলাম কে যেন একজন ঠিক দোর গোড়াতেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে অস্পষ্ট একটা ছায়ার মত।

—কে ?

কিন্তু আগন্তুক আমাব প্রশ্নেব কোন সাড়া দিল না, খানিকটা জমাট কুয়াশাব মতই যেন পাশ কাটিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকতেই আমি দবজাটা যেমন বন্ধ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাওয়ায় ঘরের একটি মাত্র ক্যাণ্ডেলেব আলোটি নির্বাপিত হলো। মুহূর্তে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চাবিদিক গ্রাস করলো। এবারে শচীন প্রশ্ন করলো—তুমি কে ?

—আমি বিভূতি। চাপা দীর্ঘশ্বাসের মত স্বাভাবিক গলায় সাড়া এলো।

—বিভূতি ? কে বিভূতি।

—বিভূতি চক্রবর্তী।

হাত বাড়িয়ে দরজাটাব ঠিক কাছেই দেয়ালে আলোর সুইচ্‌টা টিপলাম। খট কবে একটা শব্দ হলো মাত্র,কিন্তু ঘরের আলো জ্বললো না। আব ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে হলো,কে যেন ঠিক আমার পাশেই দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। নিজের অজ্ঞাতেই দু-পা পিছিয়ে একেবারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। ভয়ে তখন আমার গলা পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠেছে। হঠাৎ এমন্ সময় মনে পড়লো বিভূতি, বিভূতি চক্রবর্তী আমাদের বন্ধু। তবে।—সঙ্গে সঙ্গে যেন ভয়টা কেটে গেল।

সোৎসাহে বললাম,—বিভূতি—তুই—

—হ্যাঁ। সেই পূর্বের মত চাপা কণ্ঠস্বর। মনে হলো বড় যেন কষ্ট হচ্ছে তার কথা বলতে ! আরো মনে পড়লো বিভূতি তো থাকে সেই ভবানীপুরে। প্রায় দশ-বার দিন আড্ডায় আমাদের আসে না। সে এই প্রচণ্ড বর্ষণমুখর রাতে সেই ভবানীপুর থেকে এসেছে !

একটু বিস্ময়ই লাগে। আমি এবারে প্রশ্ন করলাম,—এই ঝড় জলের মধ্যে এত রাত্রে তুই—ব্যাপার কি বিভূতি ?

বিভূতি আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে শচীনকে সম্বোধন করে বললে,—শচীন, আমাকে তুই ডাকছিলি কেন ?

প্রশ্ন করলো এবার সরোজ,—এই জলের মধ্যে তুই এলি কি করে রে বিভু ?

—জল !

—হ্যাঁ। বাইরে ত' ভীষণ বৃষ্টি !

—তা হবে।

—তা হবে কি রে—চারিদিকে জল থৈ-থৈ করছে না ? আগেই বুঝি বের হয়েছিলি ?—বললে সরোজ।

—না ত'! শচীন ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ত এলাম।

—ভিজে গেছিস ত' একেবারে !

—না !

বলে কি বিভূতি, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি !

হঠাৎ আবার বিভূতি বললে,—আমি যাই ভাই !

—যাবি ! কোথায় যাবি এই বৃষ্টির মধ্যে ! মাথা খারাপ হলো নাকি তোর !

—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে রে, আমি আর ঘরের মধ্যে থাকতে পারছি না। আমি চললাম। বলবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা যেন খুলে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের আলোটা দপ করে জলে উঠলো।

কিন্তু কোথায় বিভূতি! আমরা ঘরের মধ্যে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছি।

—বিভূতি! বিভূতি! আমি ছুটে দরজার বাইরে গেলাম।

বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছে। গলির মধ্যে জল অনেকটা কমে এসেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কাউকে দেখতে পেলাম না। কেবল জলের মধ্যে দিয়ে কারো হেঁটে যাবার ছপ্ ছপ্ শব্দ কানে ভেসে এলো।

*　　　　*　　　　*

পরের দিন দুটো সংবাদ আমরা জানতে পারলাম। একটি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল—গত রাত্রে প্রচণ্ড তিন ঘণ্টাব্যাপী বৃষ্টির মধ্যে শহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ মিনিট কুড়ির জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, রাত্রি নয়টা পঁয়তাল্লিশ থেকে দশটা পাঁচ পর্যন্ত।

আর একটা—গত রাত্রে দিনকয়েক ভোগবার পর টাইফয়েডে আমাদের বন্ধু বিভূতি চক্রবর্তী রাত সাড়ে নয়টায় মারা গিয়েছে।

তারপর কতদিন কেটে গিয়েছে কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা আজও অস্পষ্ট হয়ে আছে। তবে স্বীকার করতে পারিনি যেমন ব্যাপারটার মধ্যে শচীনের কোন ম্যাজিকের কেরামতি আছে, যেমনি এও স্বীকার করে নিতে মন চায়নি যে, ব্যাপারটার মধ্যে কোন কিছু ভৌতিক ব্যাপার আছে। তবে যা ঘটেছিল তা বর্ণে বর্ণে সত্যি।

●

কে ? কার ছায়া ?

সমরেশ বসু

আমার ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবনে কত বৈচিত্র্যময় ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে তা নিজেও জানি না। একটা আবছা অন্ধকারের মত সেই সব দিন আজও আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। মাঝে মাঝে মনে হয় সেই পলাশ-পুরের জীর্ণ বাড়ীটার কাছে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াই—কিন্তু যাওয়ায় এখন অনেক বাধা। না আছে মন, আর না আছে সময়।

বন্ধুদের মাঝখানে গিয়ে যখন দাঁড়াই অনেকেই আমাকে অতীত জীবনের কিছু কথা বলবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু অতীত তো অতীতই। তা তো মিলিয়ে গেছে কালের কল্লোলে। তাকে আবার ফিরিয়ে এনে কি লাভ? কিন্তু এই লাভ লোকসানের হিসাব না করে, পুরানো দিনটাকে আবার ফিরে পেতে ইচ্ছা করে। সত্যি কি আমি সেদিন তাঁকে দেখেছিলুম, না তাঁর ছায়া!

*　　　*　　　*

কে? কার ছায়া?—তাহলে প্রথম থেকেই বলি—

একটা সাহিত্য-সভার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পলাশপুরে আমাকে যেতে হয়েছিল। সেখানকার তরুণদের উৎসাহে এই সভার আয়োজন হয়েছিল। যথারীতি সভা শেষ হবার পর আমার আর বাড়ী ফেরা হয়নি। রাত্রিবাস ওখানেই আমাকে করতে হয়। ওদের আতিথ্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

পলাশপুরের এই মায়াময় গ্রামের পরিবেশও আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমার থাকার জন্য হরিবিলাসবাবুর দোতলার ঘরে ব্যবস্থা করে দিলেন।

এমনি আমার সাধারণতঃ ঘুম কম। রাত প্রায় তখন দু'টো হবে। হঠাৎ দেখি আমার ঘরে কে যেন চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে! এত রাতে নিঃশব্দে চুপিচুপি কে দাঁড়িয়ে?

—কিছু মনে করবেন না। আপনার সাথে আলাপ করতে এলুম। বিকেলে অনেক চেষ্টা কবেছি। কিন্তু আমার তো প্রবেশ নিষেধ। তাই রাতের বেলায় আসতে বাধ্য হলাম।

—কিন্তু ভাই, আমি তো ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। কে আপনি? কি আপনার পরিচয়?

—আমাব পরিচয়! হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। তারপর চাপা করুণ কণ্ঠে বললেন, আমার নাম বিনায়ক সেন। ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্য করতে ভালবাসি। তাছাড়া আপনার লেখার আমি ভক্ত।—একটু থেমে বিনায়ক আবার বলল, আপনি তো মহান লোক। বলতে পারেন কোন মানুষ যদি তার কামনা বাসনা অপূর্ণ রেখে মরে যায়, তাহলে তার আত্মা কি শান্তি পায়? না তার সেই চাওয়ার জন্য আবার তাকে ফিবে আসতে হয়।....আমি হেসে বললুম, এই সব জটিল তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে কি লাভ! তার চেয়ে অন্য কথা বলুন।

বিনায়ক বললে, কি 'কথা? কোন কথা দিয়ে শুরু করব জানি না। তবে শেষ কথাটা বলতে পারি—আমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে এই ধূলিধূসর নির্মম পৃথিবী থেকে। কিন্তু কেউ জানবে না বিনায়ক সেন কি চেয়েছিল.... ?

বিনায়কের মুখে হতাশার সুর শুনে আমার হাসি পেল। বললাম, আজকের সভায় আপনি আসেননি কেন? কি হয়েছিল আপনার?

—হবে আর কি? হাসতে হাসতে বলল, ভীড়ের মধ্যে আপনার সঙ্গে আলাপ করব কি করে? তার চেয়ে এই ভালো, চুপিচুপি এসেছি, কেউ জানতেও পারবে না।

—তা তো বুঝলাম। এবার আপনি যান। কাল ন'টায় আমার ট্রেন। এবার একটু ঘুমোতে চাই।

বিনায়ক বললে, আমাকে যেতেই হবে। লোকজন আমারও ভালো লাগে না। আমার একটা কবিতা আপনাকে দিয়ে গেলাম, আপনি সময়মতো পড়ে দেখবেন।

এই বলে বিনায়ক একটা কাগজ আমার হাতে দিল। তার পর মুহূর্তেই এক দমকা হাওয়ায় ঘরের জিনিসপত্র কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। টেবিল-চেয়ার, কাগজপত্র সব যেন কেমন তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিল। আমি কি করব ঠিক বুঝতে পারলাম না। আবার বিনায়কের কণ্ঠ শোনা গেল, ভয় পাবেন না। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি চলি, আর হয়তো....

বাকীটুকু আর শোনা গেল না। নিঃশব্দে চুপি চুপি চলে গেল বিনায়ক। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। নিশ্চয়ই বিনায়কের কোন মানসিক ব্যাধি আছে। নইলে রাত দুটোর সময় এমন অদ্ভুতভাবে আলাপ করতে কেউ আসে।

কেমন করে সকাল হলো টের পাইনি। হরিবিলাসবাবু এসে বললেন, আপনার কোন কষ্ট হয়নি তো?

আমি বললুম, না। তবে এক ভদ্রলোক রাত্রিবেলায় দুটোর সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

হরিবিলাসবাবু বললেন, কি বললেন? রাত দুটোর সময়? সে আবার কে?

—বিনায়ক সেন।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে হরিবিলাসবাবু বললেন, বিনায়ক সেন! সে তো এক মাস হলো মারা গেছে। আহা বেচারা! মরেও শান্তি পায়নি। তা বিনায়ক বড় ভাল ছেলে ছিল। আপনার লেখার ভক্ত ছিল।

ওঁদের মধ্যে কে যেন বললে, বিনায়কের একটা কবিতা আপনাকে

উদ্দেশ্য করে লেখা ছিল, আপনাকে দেবার জন্যে এনেছি....এই নিন।

বিনায়কের সেই হাতের লেখাটা আমার কাছে কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। গত রাত্রে কে এসেছিল ? সেও তো একই কবিতা দিয়ে গেছে। একই হাতের লেখা।

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, এবার আমার যাবার ব্যবস্থা করে দিন।

অশরীরী

সুমথনাথ ঘোষ

কৌতূহল আজো যায় নি! ভূতপ্রেত, অশরীরী আত্মা বলে' জগতে কিছু সত্যি সত্যি আছে কিনা, অনেকের মত আমারও জানতে প্রবল ইচ্ছা জাগে মনে। তাই কোথাও কোন অলৌকিক কিছুর গন্ধ পেলেই, আগে ছুটে যাই। তবে প্রকৃত কথা বলতে কি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হয়েছি। বক্তা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রঙ চড়িয়ে, যে-সব কাহিনীকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা বাস্তব ঘটনা বলে, রোমাঞ্চিত দেহ ও বিস্মিত দৃষ্টি শ্রোতাদের সামনে উল্লেখ করে বাহাদুরী নেন, তার সাড়ে পনেরো আনাই দেখেছি, অপরের মুখে শোনা, নিজস্ব অভিজ্ঞতার ছিটেফোঁটাও তাতে নেই।

আমি ছাড়বার পাত্র নই। সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরি, আচ্ছা এটা কি সত্যি ঘটনা?

নিশ্চয়। একেবারে নির্জলা সত্যি যাকে বলে।

আপনার জীবনে ঘটেছিল? আবার প্রশ্ন করি।

বক্তা একটু থেমে এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেন, মানে হাঁ, আমার নিজের জীবনে না ঘটলেও, আমার শাশুড়ীর কাছে শোনা। তার মামার বাড়ি কানপুর, সেখানে যখন ঘটনাটা ঘটে, তিনি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন।

কেউ কেউ আবার আমার মুখে অবিশ্বাসের রেখা ফুটে উঠতে দেখে বিরক্ত হয়ে জবাব দেন, নিজের চোখে না দেখলে বুঝি সত্যি হতে নেই? অবিশ্বাস করতে হয়—এ ধারণা কোথা থেকে জন্মালো আপনার মনে?—বলে ভ্রুকুঞ্চিত করে আমায় প্রশ্ন করেন। কাল

পাইকপাড়া রোডে, একটা বাড়ির বারান্দা ভেঙে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আপনি তো চোখে দেখেন নি বলে ঘটনাটা সত্যি নয়, বলে উড়িয়ে দেবেন ?

তর্ক না করে চুপ করে যাই। মোটকথা, আমার মন ভরে না ওসব যুক্তিতে। একেবারে সোজাসুজি, যার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে ভূতপ্রেত সম্বন্ধে এমন লোকের মুখ থেকেই শুনতে চাই। যাতে অন্ততঃ বুঝতে পারি যে সত্যি ভূতপ্রেত, অশরীরী আত্মা বলে কিছু জগতে আছে এবং মন থেকে অবিশ্বাস ও সন্দেহটা একেবারে মুছে ফেলতে পারি। দু'-চারজন এমন লোকের সাক্ষাৎ যে পাই নি, তা নয়। তবে বিশ্লেষণ করে দেখেছি, তার মূলে আছে মানসিক বিকৃতি বা দৃষ্টির বিভ্রম বা আত্মসম্মোহন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় হয়তো আরো অনেক কিছু তার নামকরণ করা যেতে পারে।

যাক গে, ওসব বাজে কথা এখন থাক। যে কথাটা আসলে আমি বলতে চাই, তা হচ্ছে, একদিন কিন্তু হঠাৎ ট্রেনে এক ভদ্র-লোকের মুখে এমন এক কাহিনী শুনেছিলুম যা আমার চিন্তাজগতে সত্যি একটা বিপ্লব এনে দিয়েছিল। কিন্তু সেই এক এবং অদ্বিতীয়। ও ছাড়া তেমন আর কিছু আজো শুনি নি, তাই এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কোন ধারণা এখনো মনের মধ্যে গড়ে তুলতে পারি নি। প্রহেলিকার মধ্যে যেন রয়েছি।

ঘটনাটা এই রকম।

সেবার বোম্বাই যাচ্ছিলুম। নাগপুর থেকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঠলেন কামরায়। ছোট্ট ফার্স্ট ক্লাশ সেই কামরায়, আমরা শুধু দু'টি প্রাণী। কথায় কথায় আলাপ জমে উঠলো। ভদ্রলোক প্রায় চল্লিশ বছর বাংলাদেশ ছাড়া। একজন বাঙালীকে এভাবে একাকী নিজের কাছে পেয়ে নিমেষে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। বেশ হাসিখুশী মজার মানুষটি। মাথাজোড়া টাক। এককালে খুবই বলিষ্ঠ ছিলেন। বয়স সত্তর পেরিয়েছেন এই জানুয়ারীতে। না বললে, এখনো মুখ-

চোখ দেখলে মনে হয় পঞ্চান্ন—ছাপ্পান্ন বড়জোর হবে। ভদ্রলোকের একটি বদ্‌ অভ্যাস মুহুর্মুহু চুরুট খান।

প্রথমে খুচরো মামুলী আলাপ শুরু হলো। যেমন—দেশ, জন্মস্থান, চাকরিবাকরি, ছেলেমেয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর দেশেব রাজনৈতিক অবস্থা, নেহরু-গভর্ণমেণ্টের কেচ্ছা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ক্রুশ্চেভ, আইসেনহাওয়ার থেকে বাঙালীর কি ছিল আর আজ কি হয়েছে ইত্যাদি। বিলাপ ও সংলাপের পর যখন চুরুটটায় আবার অগ্নিসংযোগ করার জন্যে চুপ করলেন, আমি প্রসঙ্গটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাবার জন্যে বললুম, আচ্ছা, আপনি যখন এখানে দীর্ঘদিন আছেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়িঘর, জমিজমা অনেক কিছু করেছেন তখন একটা খবর নিশ্চয় আমাকে বলতে পারবেন।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি সাগ্রহে বলে উঠলেন, বলুন, কি খবর ?

আমি বললুম, আচ্ছা, একবার কিছুদিন আগে কাগজে খবর বেরিয়েছিল, আপনাদের এই নাগপুরে একটা বাড়িতে ভূতের দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে—তিনটে লোককে নাকি মেরে ফেলেছে। ব্যাপারটা কতদূর সত্যি, জানেন কিছু ?

ভদ্রলোকের কপালের কয়েকটা রেখা একসঙ্গে কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন—কই, মনে পড়ছে না তো তেমন কিছু ! তারপর চুরুটের ধোঁয়া একমুখ ছেড়ে বললেন, কি জানি ! নাগপুর তো ছোট জায়গা নয়। হতে পারে অনেক কিছুই, কে আর খবর রাখে বলুন।

আমি বললুম, আচ্ছা, আপনার কি ধারণা ভূত-প্রেত বলে কিছু আছে—আপনি বিশ্বাস করেন ?

চুরুটটা মুখ থেকে টেনে নিয়ে ভদ্রলোক আমার চোখের ওপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মুহূর্তকয়েক চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, সত্যি কথা বলতে কি, একদিন ছিল যখন একেবারেই বিশ্বাস করতুম না। তবে, একটা ঘটনা আমার জীবনে যা ঘটেছে, তারপর আর, না বলতে সাহস পাই না।

কৌতূহল উগ্র হয়ে উঠলো। বললুম, কি রকম ?

সে এক অবিশ্বাস্য কাহিনী মশাই, শুনলে আপনিও হয়তো ঠাট্টা করবেন, লোকটার মাথা খারাপ নাকি ? কিন্তু সত্যি আমার জীবনে যা ঘটেছিল, যাকে প্রত্যক্ষ করেছি, কেমন করে 'কিছু নয়' বলে উড়িয়ে দিই, বলুন তো ?

প্রত্যক্ষ করেছেন ?

হাঁ। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়লো। রাত তখন অনেক। বোধ হয় বারোটার কাছাকাছি। গাড়ী ছুটেছে উন্মত্ত বেগে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, শুধু জমাট গাঢ় অন্ধকার, আর দু'পাশে—পাহাড়, বনজঙ্গলের ঠেসাঠেসি। ঠিক মনে নেই, সেদিনটা বোধ হয় অমাবস্যা ছিল।

যাহোক, ভদ্রলোককে চিন্তামগ্ন দেখে বললুম, আপনার জীবনে ঘটেছিল, বলেন কি ?

হাঁ। বলেই তিনি এমন ভাবে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন যেন কথাটা আমার কাছে বলা উচিত হবে কিনা, তাই ভাবছেন আতঙ্কে!

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাঁর কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্ন করলুম, এই নাগপুরেই কি ঘটেছিল ?

না।—বলেই তিনি যেন ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলেন। কি একটা মর্মান্তিক কথা যেন হঠাৎ মনে পড়ে যায়।

চোখ দুটো আস্তে আস্তে আমার চোখের ওপর রেখে তিনি বললেন, যাদুকর নরপতির নাম শুনেছেন ?

আরে বাপ! তিনি তো মস্ত বড় ম্যাজিসিয়ান ছিলেন। একবার সরস্বতী পূজোর সময় হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে তাঁর খেলা দেখতে গিয়েছিলুম। দুটি ছোকরা আমার সামনে অজ্ঞান হয়ে গেল, যখন তিনি একটা মেয়েকে ষ্টেজের ওপর কেটে দু'ভাগ করে, আবার জুড়ে দিলেন।

ভদ্রলোক বললেন, শেষদিকে নরপতি ভূতের খেলায় খুব নাম করেছিলেন। শুনেছি, বিলেত-আমেরিকায় নাকি বহু লোক তাঁর

এই খেলা দেখতে দেখতে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে সীট থেকে পড়ে গেছে। এমন দিন ছিল না, যেদিন অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হয় নি।—বলে সহসা নীরব হয়ে যেন কি ভাবতে লাগলেন। নিঃশব্দ চুরুটটা যে তাঁর আঙুলের ফাঁকে পুড়ছে, সেদিকে কোন খেয়াল ছিল না।

বোম্বাই মেল্ ছুটছিল। হঠাৎ একটা বড় জংশন ষ্টেশনের মুখে ঢোকবার আগে ঝনঝন করে লাইনে কি একটা শব্দ হতেই তাঁর চমক ভাঙলো। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি শুরু করলেন, এই নবপতি ছিল আমার একেবারে বাল্যবন্ধু, যাকে বলে ল্যাংটো বেলার ইয়ার। গ্রামের পাঠশালে, স্কুলে ও কলেজে একসঙ্গে পড়েছিলুম; তারপর কার্যোপলক্ষে দু'জনের জীবন দু'পথে বেঁকে গেলেও, অন্ততঃ বছরে একবার ৺বিজয়াদশমীর প্রীতি-আলিঙ্গন জানিয়ে চিঠি দিতে কখনো তার ভুল হতো না। তা যেখানেই থাকুক—বিলেত, আমেরিকা বা কলকাতায়। এত টাকা, এত নামযশ, এত বড়লোক হয়েছিল, কিন্তু তা বলে বাল্যবন্ধুকে কোনদিন ভোলে নি বা কৃপার চোখেও দেখে নি।

একবার নাগপুরে খেলা দেখাতে এসেছিল। গভর্ণমেণ্ট-আতিথ্য গ্রহণ না করে, সোজা আমার বাড়িতে এসে উঠলো। ওঃ, তা নিয়ে শহরে কি চাঞ্চল্য! ওই যা ভুলে গেছি!

হাঁ, যে কথাটা বলছিলুম।—বলে ভদ্রলোক আবার ফিরে এলেন, পূর্বের আলোচনায়। সেবার ৺বিজয়ার পরদিন আপিসে বসে কাজ করছি, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। ট্রাঙ্ককল্ ফ্রম্ বোম্বে।

হ্যাল্লো!—বলে তাড়াতাড়ি ফোনটা কানে তুলতেই উত্তর এলো। জগদীশ তুই? আমি যাদুকর নরপতি বলছি।

হাঁ, কি খবর? হঠাৎ ট্রাঙ্ককল্ যে!

খবর সব ভাল। আর একটু পরেই আমার জাহাজ ছাড়বে বোম্বে থেকে। এবার খেলা দেখাতে যাচ্ছি জাভায়। তাই ৺বিজয়ার প্রীতি-ভালবাসা ও আলিঙ্গন জানাচ্ছি। বলে একটু থেমে কেমন অদ্ভুত

কণ্ঠে যেন আবার সে বললে, ভাই, বোধ হয় এই শেষ বিজয়া আমার জীবনে, তাই চিঠিতে না জানিয়ে নিজে মুখে জানিয়ে যাচ্ছি।

কি যা-তা অমঙ্গলের কথা বলছিস—বিদেশযাত্রার আগে! যত বুড়ো হচ্ছিস, তোর যেন ছেলেমানুষি বাড়ছে! বলে মৃদু তিরস্কার করে সেই সঙ্গে আমিও তাকে ৺বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ জানালুম।

সে বললে, সত্যি বলছি ভাই, এবার মনে কেমন যেন ভয় হচ্ছে। হয়তো আর ফিরবো না! জানিস তারা আমাকে মেরে ফেলবে বলে শাসিয়েছে।

কারা! চমকে উঠলুম। যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো আমার সামনে!

যাদুকরের গলাটা নিমেষে আর একটু কেঁপে উঠলো। বললে, যে-সব অশরীরী আত্মাদের নিয়ে খেলা দেখাই, তাদের দলপতি। তুই হয়তো ভাবছিস ঠাট্টা করছি, ষ্টেজের ওপর কৃত্রিম সিয়াস্ বসিয়ে কল্পিত ভূত-প্রেত আমদানি করে লোক ঠকিয়ে যে এতদিন খাচ্ছে, আজ তার মুখে এ কি কথা!

হাঁ, আজ সেই কথাটাই তোকে বলে যেতে চাই, যা আর দ্বিতীয় কোন প্রাণী জানে না। হয়তো আর জানবেও না। বলে সে শুরু করলে, জানিস ইদানীং ভূতের খেলা দেখাতে দেখাতে মনে হতো যেন, সত্যিকারের কতগুলি বিকট ছায়ামূর্তি আমার আশেপাশে ঘুরছে। গ্রাহ্য করি নি। কিন্তু একদিন অন্ধকার ষ্টেজের ওপর থেকে দেখি এক বিকটাকৃতি ছায়ামূর্তি উইংস্-এর পাশে দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আতঙ্কে ডাক ছেড়ে চিৎকার করে উঠলুম। দর্শকরা কিন্তু তাই শুনে সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়ে আমায় সংবর্ধনা জানালে। সবাই ধন্যি ধন্যি করতে লাগল সেদিনের খেলার। আমি একেবারে চুপ। ভেতরে ঠকঠক করে কাঁপছি। কাউকে কিছু বলি নি।

সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, কে যেন আমায় বলছে সাবধান,

ভূত-প্রেত নিয়ে রঙ্গরস করে, লোকের সামনে অশরীরী আত্মাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মজা একদিন টের পাইয়ে দেবো। এখনো যদি ভাল চাও তো ও আত্মঘাতী খেলা বন্ধ কর। নইলে তোমার জীবন-সঙ্কট ঘটবে বলে দিচ্ছি।

পরের দিন কিন্তু আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। ষ্টেজের ওপর ভূয়ো 'মিডিয়ম্' নিয়ে কৃত্রিম 'সিয়াস্' যেমন প্রতিদিন বসাই, সেদিনও তেমনি বসিয়েছি, এমন সময় দেখি আমার সেই মিডিয়ম ছোকরাটি সত্যি অচৈতন্য হয়ে পড়েছে অথচ তার হাত লিখে চলেছে টেবিলের ওপর সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে। কিছুক্ষণ পরে সহসা তার হাতটা থেমে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ খুলে চাইলে। আমি তাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপার কি? সে যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠেছে, এমনিভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, কিছু নয় তো! আমি কাগজখানা নিয়ে তখন পকেটে পুরে রাখলুম নিজের ঘরে এসে দেখি লেখা, সাবধান, আবার বলছি এখনো সাবধান! বন্ধ করে দে এ খেলা! ইতি—তারকনাথ তান্ত্রিক, পিশাচসিদ্ধ।

সবে এই কথাটা উচ্চারণ করেছে নরপতি, অমনি যেন কে জোর করে টেলিফোনটা কেটে দিলে। হ্যাল্লো, হ্যাল্লো, বলে অনেক ডাকাডাকি করেও আর কোন সাড়া পেলুম না।

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক কেমন এক রহস্যভরা দৃষ্টিতে আমার মুখের ওপর তাকিয়ে রইলেন। আমি বললুম, তারানাথ তান্ত্রিক ও লোকটা একেবারে বাজে 'বোগাস্' ছিল। পিশাচসিদ্ধ না হাতী! যখন জীবিত ছিল একবার আমি বিভূতি বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে গিয়েছিলুম তাকে দেখতে। ওঃ, সে কি এখানে? হাওড়া জেলার কোন এক অজ-পল্লীগ্রামে মার্টিন কোম্পানীর রেল থেকে নেমে ডাহা আড়াই ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে যেতে হয়। বললে বিশ্বাস করবেন না, এত কষ্ট সব জলে গেল। ওখানকার লোকেরা দেখলুম ভয় করে পিশাচ-সিদ্ধ তান্ত্রিকের নাম উল্লেখ করতে গেলেই আগে দু'হাত জোড় করে

কপালে ঠেকায়। আমাদের কিন্তু মনে হলো লোকটা একেবারে বাজে 'বোগাস্'।

'বোগাস্' কথাটা বলা শেষ হয় নি তখনো, অমনি দপ করে গাড়ীর আলোটা নিভে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো, এ কি! আলো নেভালো কে?

আমি হেসে জবাব দিলুম, কে আবার নেভাবে? 'ফিউজ' হয়ে গেল। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামলে গার্ডকে বলে ঠিক করিয়ে নেবো। বলেই আবার ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলুম, হ্যাঁ তারপর কি হলো?

কি আর হবে! মাস তিনেক আর কোন খবর নেই। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় একটা সংবাদ বেরিয়েছে— 'জাভার বিখ্যাত বঙ্গমঞ্চে ভৌতিক ক্রীড়া প্রদর্শনকালে যাদুকর নরপতি অকস্মাৎ ষ্টেজের ওপর থেকে অজ্ঞান হয়ে নীচে পড়ে যান। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, খেলা দেখাবার সময় সত্যিকারের প্রেতাত্মা তাকে এইভাবে ঠেলা মেরে ফেলে দিয়েছিল। এই সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং একাদিক্রমে দু'মাস ধ'রে একই রঙ্গমঞ্চে 'ফুল হাউস' চলে।"

আমি একটু হেসে বললুম, ওকে বলে 'বিজেনেস ষ্টাণ্ট'—ব্যবসা জমাবার ফন্দী। কি চমৎকার ব্যবসাবুদ্ধি দেখেছেন যাদুকরের!

ভদ্রলোক এবার চটে উঠলেন, চুপ করুন মশায়। আগে সব শুনুন, তারপর লাফাবেন। পরদিন তাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালুম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমার জীবন তিনি রক্ষা করেছেন!

এর ঠিক পনেরো দিন পরে নরপতির এক চিঠি পেলুম, সেদিন আমার কথা শুনে ঠাট্টা মনে করেছিলি, কিন্তু খুব জোর বেঁচে গেছি। তারানাথ তান্ত্রিক পিশাচসিদ্ধ, সাংঘাতিক শত্রুতা করেছে। জানি না, কপালে কি আছে। হয়তো এই শেষ চিঠি আমার তোকে।

একটু থেমে ভদ্রলোক এবার চুরুটটা জ্বেলে নিলেন। নিভে গিয়েছিল। তারপর বারকতক টান দিয়ে আবার বললেন, এর কিছু-দিন পরে, বেশ মনে আছে সে দিনটা ছিল কিসের ছুটি, আপিস আদালত সব বন্ধ। আমি একাই আপিসঘরে বসে কাজ করছি। জরুরী কাজ। পরদিন ইন্‌কাম-ট্যাক্সের হিসাবনিকাশ দাখিল করতে হবে। হঠাৎ দারোয়ান এসে খবর দিলে, এক ছোক্‌রী আব্‌সে ভেট্ করনে মাঙ্গতা।

মুখটা কাগজ থেকে না তুলেই জবাব দিলুম, আজ নেহি হোগা, কাল আনে বলো।

একটু বাদে ঘুরে এসে দারোয়ান আমার হাতে একটা ছোট্ট কাগজের শ্লিপ দিলে, তাতে লেখা—শ্রীলীনা চ্যাটার্জ্জী—ফ্রম্ তারানাথ তান্ত্রিক, পিশাচসিদ্ধ।

আরে, তারানাথ তান্ত্রিক তো মরে ভূত হয়ে গেছে কবে! তার কাছ থেকে আসছে? ব্যাপাব কি! কৌতূহল হলো। দারোয়ানকে বললুম তাকে পাঠিয়ে দিতে।

একটু পরেই সেই মেয়েটি এসে ঢুকলো ঘরে। ধবধবে রঙ কিন্তু ফর্সা বলা চলে না, যেন বিবর্ণ। বয়েস চৌদ্দও হতে পারে আবাব চব্বিশও অসম্ভব নয়। ক্ষয়া, ঘষা, অপুষ্ট চেহাবা, মুখ, চোখ, নাক সবই আছে, অথচ কোনটাই ঠিক ঠিক মত নয়। মাথার চুলগুলো কটা, অস্বাভাবিক রকমের লাল্‌চে। কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে বসলো আমার সামনে, মুখোমুখি টেবিলেব ওপরে! বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে তার আপাদমস্তক একবার বুলিয়ে নিয়ে বললুম, আপনার নাম লীনা চ্যাটার্জ্জী?

মেয়েটি জবাব দিলে, হাঁ। তাব গলার স্বরটা মোটেই মেয়েদের মত নরম নয়! কেমন যেন ভারি ভারি মোটা, কর্কশ। বললুম, কি দরকার আমার সঙ্গে?

মেয়েটি ছোট্ট একটা খামেমোড়া চিঠি আমার হাতে দিয়ে

বললে, তারানাথ তান্ত্রিক এই চিঠিটা আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমি বললুম, তিনি তো মারা গেছেন অনেকদিন! এ চিঠি আপনার কাছে কেমন করে এলো?

মেয়েটি বললে, আমি তাঁর মিডিয়ম্—তাঁর আত্মা আমার দেহটা অধিকার করে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে তাঁর যা বক্তব্য লেখায়। যন্ত্রস্বরূপ আমার হাতটা শুধু তিনি ব্যবহার করেন মাত্র। কি লিখি, কেন লিখি, কিছুই আমি জানি না। স্বপ্নাবিষ্টের মত শুধু আমার হাত কাজ করে যায়।

চিঠিটা হাতে করে আমি বললুম, আচ্ছা, আমার নাম-ঠিকানা এসব তিনি পেলেন কোথায়?

মেয়েটি অদ্ভুত এক ধরনের হাসি হেসে উঠলো। তিনি পিশাচ-সিদ্ধ, পৃথিবীর যেখানে যে মানুষ থাকুক, তার নাম-ঠিকানা জানতে তাঁর কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে মাত্র! আচ্ছা, নমস্কার। বলেই মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে চলে যেতে আমি খামটা ছিঁড়ে চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে চমকে উঠলুম! ছোট্ট চিঠি, মাত্র তিনটি লাইন, পেন্সিলে লেখা: তোমার বন্ধু ভেবেছে কি?, জগতের সামনে আমাদের নিয়ে এইভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর কত করবে? সেদিন একটা আছাড় মেরেছিলুম। তাতেও শিক্ষা হয় নি! আজ থেকে সাতদিন সময় দিলুম, যদি এই সব খেলা বন্ধ না করে তা'হলে আর আমি ঠেকাতে পারবো না মৃতার মৃত্যুকে। সবাই ক্ষেপে উঠেছে। ইতি—তারানাথ তান্ত্রিক।

ভদ্রলোক এই বলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হুহু করে ছুটে চলেছে ট্রেন। বাইরে যেমন অন্ধকার গাড়ীর ভেতরটায় যেন তার চেয়েও বেশি।

আমি তখন আর কৌতুহল চেপে রাখতে পারছিলুম না। বললুম, তারপর কি হলো?

ভদ্রলোক বললেন, তারপর আর কি ! কোন্ দেশে, কোথায় নরপতি খেলা দেখাচ্ছে জানি না, তবু একখানা চিঠি ও একটা তার দিলুম ভৌতিক খেলা দেখাতে নিষেধ করে। জানি না সে চিঠি ওর কাছে পৌঁছেছিল কিনা। কারণ ঠিক তার সাতদিন পরে কাগজে যাদুকর নরপতির মৃত্যুসংবাদ দেখে একেবারে আঁতকে উঠেছিলুম ! সংবাদ বেরিয়েছে, ভৌতিক-ক্রীড়া প্রদর্শনকালে অকস্মাৎ হার্টফেল করায় যাদুকরের মৃত্যু হয়ে ষ্টেজের ওপর।

আমি বললুম, বলেন কি !

ভদ্রলোক বিষণ্ণস্বরে বললেন, এর পরেও আপনি বিশ্বাস করতে বলেন অশরীরী আত্মা বলে কিছু নেই, ভূত-প্রেত সব মিথ্যা !

ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাস করেছিলুম কিনা জোর করে বলতে পারি না। তবে হাঁ-না কোন উত্তর না দিয়ে ক্ষাণিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাঁর মুখের দিকে যে তাকিয়েছিলুম তা বেশ মনে আছে।

ডাকবাংলোর হাতছানি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জানতাম না। পরে জানলাম....

সামনের ডাকবাংলোর ম্যানেজার অনিরুদ্ধ আমাকে বললেন, যখন এসেছেন, কদিন এখানে থেকে যান। দেখবেন জায়গাটা আপনার ভালো লাগবে।

অনিরুদ্ধ ঠিকই বলেছেন। এখানকার সব কিছুই ভালো লাগারই মতো। বিশেষ করে এই ডাকবাংলো। সন্ধ্যে হলেই সামনের পাহাড়টা কি রকম আশ্চর্য্য লাগত। মনে হত, কোন দুর্গম রহস্যের হাতছানি দিয়ে কে যেন ডাকে।

সামনে অবারিত মাঠ, ওপরে নীল আকাশ। মুক্ত বিহঙ্গীর দল আপন মনে খেলা করে...।

ইজি-চেয়ারের ওপর বসে আজকের সংবাদপত্রটা ওল্টাচ্ছিলাম। এমন সময় পাশের ঘরের বিনয়বাবু এলেন এবং বিনা ভূমিকায় বললেন, শুনলাম আপনি নাকি বিহার থেকে এসেছেন।

—ঠিকই শুনেছেন।

—বিহারে কোথায় ছিলেন ?

—ডাকোযা-কোঠা—

—আশ্চর্য মশাই। আমিও তো ওখানে কয়েক বছর ছিলাম। মানে রেল-জীবনের কাজের তাগিদে। তা জায়গাটা খুব ভাল। তবে বাঙালীর সংখ্যা খুবই কম।

—হবে হয়ত! তবে আমি গিয়েছিলাম বেড়াতে নয়। সাধ করে কেউ ঐ গ্রামে বেড়াতে যায় নাকি! গিয়েছিলাম ওখানকার

আদি-বাসীদের জীবনযাত্রার খবরা-খবর নিতে। সরকারী কাজ করি কিনা....।

—তা এখানেও কি কাজে এসেছেন নাকি ?

—না। এখানে এসেছি কদিন বিশ্রাম নেব বলে।

হাসলেন বিনয়বাবু। তারপর সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে আমাকে দিলেন, নিজেও ধরালেন।

সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এসেছে।

সামনের পাহাড়টার ওপরে এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একদল লোক হৈ হৈ করতে করতে যাচ্ছে। ওদের প্রত্যেকের হাতে মশাল। হয়তো কোন আসন্ন উৎসবের জন্য ওরা তৈরী হচ্ছে। পরে জানলাম, ভাদু উৎসব। ভাদ্র মাস এলেই এই উৎসব শুরু হয়। বিনয়বাবু যাবার আগে বললেন, চলুন না, আজ ওপারটা ঘুরে আসি। এখানে এসে তো আপনি দিনরাত খালি বই পড়ছেন, আর কি সব লিখছেন। একদণ্ডের জন্যে বেরুতেও তো দেখিনা।

—বলেছি তো এখানে এসেছি বিশ্রামের জন্য।

রাত তখন প্রায় দশটা হবে! রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে যাব, সেই সময় আবার বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা।

তিনি বললেন, আপনি মশাই সত্যিকারের সুখী লোক। রাতের খাবার এর মধ্যে খেয়ে নিলেন।

—হ্যাঁ। রাতের খাবার আমি দশটার মধ্যেই খাই। এটা আমার চিরদিনের অভ্যাস।

আমার নিজের ঘরে এসে কাগজপত্র নিয়ে কিছু লিখবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু হ'ল না। আশ্চর্য! লেখার কাগজগুলি উড়তে লাগল। কালি কলমও সেই সঙ্গে। কি ব্যাপার? কোন ভোজবাজি নাকি?

ঘরটা বন্ধ করেই রেখেছিলাম। হঠাৎ বিনয়বাবু এসে হাজির। আমি অবাক হয়ে গেলাম! বললাম, আপনি? এক গাল হেসে বিনয়বাবু বললেন, আমার না এলে কি চলে? আমি····

—কিন্তু ঘর তো বন্ধ, কি করে এলেন?

এবার বিনয়বাবু বললেন, ঘর বন্ধ তাতে কি? আমি মুক্ত। সর্বত্র আমার অবাধ গতি।

আমার যেন কেমন একটা মনে হ'ল। ইনি বিনয়বাবু নয়, অন্য কেউ। হয়তো আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন।

আমি একটু গম্ভীরভাবে বললাম, এবার আমার একটু ব্যক্তিগত কাজ আছে, আপনি দয়া করে যান।

—আপনি যে লিখবেন, আপনার কাগজ, কলম, কালি কই? হাওয়ায় উড়ে গেছে। যাকগে·······

এই বলে চোখের সামনে কাগজ কলম, কালি দিয়ে বললেন, এই নিন।

আমার তখন সত্যি ভয় ভয় করছিল। বিনয়বাবু বললেন, চলি আর দেখা হবে না।

আমি বিনয়বাবুকে ধরতে গেলাম। আশ্চর্য! কোথায় বিনয়বাবু? তার পরিবর্তে তার পরণের জামা কাপড় পড়ে আছে মাটির উপর।

তারপর কি হলো আমার আর মনে নাই।····

জানতাম না। পরে জানলাম, বিনয়বাবু নামক এক ভদ্রলোক এই ডাকবাংলোয় এসেছিলেন, কিন্তু যেদিন আসেন, তারপরের দিনই মারা যান। ওই ঘরটা সেদিন থেকেই বন্ধ ছিল। এর আগেও দু-একজন ভদ্রলোক এসে বাস করতে পারেনি। বাংলোর ম্যানেজার অনিরুদ্ধবাবু তার ব্যবসার জন্য এ কথা কাউকে বলতেন না। কিন্তু ঘরটা বন্ধ করতে বাধ্য হন।

অনিরুদ্ধবাবু বললেন, বিনয়বাবু নিজেও একজন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কিন্তু কারও ক্ষতি করেন না। কেন জানি না, আপনাকে তাঁর ভালো লেগেছিল। তাই তিনি আপনাব সঙ্গে আলাপ কবেছিলেন। একি আপনি চললেন কোথায় ?

—আর কোথায় ? 'ফিরে চল আপন ঘবে।' এখানকাব কাজ আমার ফুরিয়েছে।

অনিরুদ্ধবাবু বললেন, আবাব এদিকে এলে আসবেন।

—আসবো।

এ কথা বলা ছাড়া আমাব আব উপায় ছিল না।

●

কঙ্কালের টঙ্কার

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমি কবিতা লিখতুম, আমাব আত্মীয়বা আমায় তিবস্কার কবতেন, বন্ধুবা ঠাট্টা কবতেন, মাষ্টাবমশাই প্রহাব দিতেন এবং কাগজের সম্পাদকেবা না-ছেপে ফেবৎ দিতেন। কিন্তু বলে বাখি, একদিন সমূহ' বিপদ্ থেকে যে আমাব প্রাণবক্ষা হয়েছিল, সে শুধু আমাব ঐ কবিত্বশক্তিব জোবে। তোমবা আশ্চর্য হচ্ছ কবিতা আমাব প্রাণবক্ষা কবলে কেমন ক'বে? সত্যি বল্ছি, সেদিন কাবো সাধ্য ছিল না যে, মবণাপন্ন আমাকে বক্ষা কবে। ভাগ্যিস কবিতা লিখতে শিখেছিলুম, তাই বেঁচে গেলুম। নইলে লোকেব অত্যাচাবে কবিতা লক্ষ্মীকে বাল্যবয়সে বিদায় দিলে সেদিন আমাব যে কি অবস্থা হতো, তা আমিই জানি।

গল্পটা তাহ'লে খুলেই বলি। নানা স্থান ঘুবে আমি যাচ্ছিলুম জয়পুব থেকে দিল্লী। টাইম-টেব্ল্ খুলে দেখলুম, টানা দিল্লী যেতে হলে রাত্রেব গাড়িতেই সুবিধে। কিন্তু সে-ট্রেন অনেক বাত্রে ছাড়ে— প্রায় দু'টো। একে জয়পুরের মতো জায়গা, তায় মাঘমাসের শীত, তার উপব রাত্রি দুটো এই ত্রহস্পর্শ ঘাড়ে নিয়ে যাত্রা কবতে আতঙ্কে আমার বুক কাঁপতে লাগলো। কিন্তু উপায় কি? আমি ষ্টেশন-মাষ্টারকে বল্লুম —"কি উপায় করা যায়, বলুন দেখি? এই দারুণ শীতে ভোর রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে ট্রেন ধববাব কথা মনে করতেই তো আমার কম্প দিয়ে জ্বর আসছে!"

ষ্টেশন-মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন— আপনি কি ফাষ্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার? তখন বড়দিনের ছুটিতে রেল-কোম্পানী আধাভাড়ায় সর্বত্র-যাতায়াতের

ব্যবস্থা করায় আমি সস্তায় বড়-মানুষি করেছিলুম। বুক ফুলিয়ে বল্লুম —"হ্যাঁ, আমার ফার্স্ট-ক্লাসের টিকিট।" ষ্টেশন-মাষ্টার বল্লেন—"প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে খুব একটা ভাল ব্যবস্থা আছে।"

আমি বল্লুম—"কি?"

তিনি বল্লেন—"আপনি এক কাজ করবেন। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে ষ্টেশনে আসবেন। আপনার জন্যে একখানা ফার্স্ট-ক্লাস গাড়ি ঐ সাইডিঙে কেটে রেখে দেবো, আপনি তাতেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়বেন লেপ মুড়ি দিয়ে। তারপর রাত্রে যখন মেল আসবে, তাতেই আপনার গাড়ী লাগিয়ে দেবো—আপনি দিব্যি ঘুমুতে ঘুমুতে দিল্লী গিয়ে পৌঁছবেন।"

আমি বল্লুম—"বাঃ এতো বেশ!"

ষ্টেশন-মাষ্টার বল্লেন—"হ্যাঁ শীতের রাত্রে গাড়ি ধরবার অসুবিধে বলেই তো কোম্পানী বড় লোক যাত্রীদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছেন।

আমি বল্লুম—"খুব ভালো ব্যবস্থা। আমি আটটার মধ্যেই আসবো —আপনি গাড়ি ঠিক করে রাখবেন।" তিনি বল্লেন—"গাড়ি ঠিক থাকবে। কিন্তু আপনি দেরী করবেন না। আটটার পর আর ট্রেন নেই ব'লে আমরা আটটার সময় ষ্টেশন বন্ধ করে চলে যাই।"

আমি বল্লুম—"আটটার মধ্যেই আসবো।" বলে আমি চলে গেলুম।

তারপর সন্ধ্যাবেলা আহারাদি সেরে পায়ে তিনজোড়া ডবল-মোজা, গায়ে দুটো গরম গেঞ্জির উপর একটা মোটা ফ্লানেলের কামিজ, তার উপর সোয়েটার, তার উপর তুলো ভরা মেরজাই, তার উপর ওয়েষ্ট কোট, কোট, ওভার-কোট এবং সর্বোপরি একটা মোটা বালাপোষ মুড়ি দিয়ে, মাথাটাকে কান-চাপা টুপি ও পশমের গলাবন্ধ দিয়ে এঁটে কাঁপতে কাঁপতে ঠিক আটটার সময় ষ্টেশনে এসে হাজির হলুম।

আমার মস্ত-বড় লোহার তোরঙ্গটা দু'জন কুলি এসে ধরাধরি ক'রে

নামাতে গিয়ে একজন ফিক্ ক'রে একটু হেসে ছেড়ে দিলে। আমি বল্লুম—"কেয়া হলো বে।"

সে বল্লে—"বাবুজির তোরঙ্গ দেখছি ফাঁকা। যা দু'-একঠো ধুতি উতি আছে, সেগুলি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাক্সটি আমাদের বখশিস্ ক'রে যান বাবু—আপনার কুলি-ভাড়া, রেল-মাশুল অনেক বেঁচে যাবে।"

আমি বল্লুম—"যা, যা, তোম্‌কো আর ইয়ে করতে হবে না!" ব'লেই আমি হন্ হন্ ক'রে ষ্টেশন-মাষ্টারেব ঘবের দিকে চলে গেলুম। ষ্টেশন-মাষ্টার আমাকে দেখেই বল্লেন—"গুড্ ইভিনিং বাবু। আপনাব ভাগ্য খুব ভালো আজ আব কোন প্যাসেঞ্জার নেই; সমস্ত গাডিটাই আপনাব একলাব। চলুন, আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।" ব'লে তিনি আমাকে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম পেবিয়ে, পাঁচ-ছয়টা রেল-লাইন টপ্‌কে অনেক দূর চলে চলে একটা ফাঁকা মাঠের ধারে এনে দাঁড় করালেন। সামনে দেখলুম, একখানা ধোঁয়াটে রঙের গাড়ি কাটা পড়ে রয়েছে—ঠিক যেন একটা কন্ধকাটা, অন্ধকারের আড়ালে গা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! মাষ্টারবাবু গাড়িটার চাবি খুলে দিয়ে বল্লেন—"নিন্—উঠে পড়ুন। বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন।" ব'লেই তাড়াতাড়ি তাঁর হাত-বাতিটা তুলে নিয়ে "গুড্-নাইট"—ব'লে ছুট দিলেন। অন্ধকারে তাকে আব দেখতে 'পেলুম না, বেল-লাইনের খোয়াগুলোর উপর তাঁর জুতোর খস্‌খস্ শব্দ কেবল শুনতে লাগলুম। ছ্যাঁৎ ক'রে আমার মনে হলো—তাই তো মাষ্টারবাবু অমন ক'রে পালালেন কেন

ইতিমধ্যে দেখি, কুলি-দুটো আমার তোরঙ্গ ও বিছানাটা গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়েই বলছে—"বাবুজি পয়সা।" আমি তাদের হাতে পয়সা দিতেই, তারাও ছুট দিলে ষ্টেশনের দিকে। ব্যাপার কি? আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ভাবছি, দেখি দুটো কয়লা-মাখা কালো ভূত রেল-লাইনের বাঁধের নীচে থেকে উঠে অন্ধকারের মধ্যে কেবল

চারটে সাদা চোখ দিয়ে আমায় দেখতে দেখতে ষ্টেশনের দিকে চলে গেল। তাদের পিছনে একটা কুকুর ল্যাজ তুলে দৌড় দিলে। তার পরেই সব একেবারে নিস্তব্ধ। একেবারে অন্ধকার!

অমাবস্যার রাত্রি—চারিদিক অন্ধকার ঘুট্‌ঘুট্ করছে। সেই অন্ধকারে একটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক্ চারিদিক্ দেখতে লাগলুম— আশে পাশে কেউ নেই, দূরে কেবল গাছগুলো অসাড় হয়ে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের ভিতরটা কেমন ছম্‌ছম্ করতে লাগলো।

আমি আস্তে আস্তে গাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠলুম। গাড়ির ভিতরটা একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। তাড়াতাড়ি দেওয়াল হাৎড়ে বিজ্‌লিবাতির চাবি টিপলুম—খুট ক'রে শব্দ হ'লো, আলো হলো না। সর্বনাশ! আলো নাই না কি? আলোর সুইচ্ নিয়ে অনেক নাড়ানাড়ি করলুম, কোনই ফল হলো না, যেমন অন্ধকার যেমনই, পকেট— খুঁজলুম, দিয়েশলাই নেই। কেমন ক'রেই বা থাকবে? তোরঙ্গের মধ্যে একটা দিয়েশালাই আছে। চাবি খুঁজতে লাগলুম, পৈতেতে চাবি বাঁধা ছিল, বালাপোষ, ওভার-কোট, কোট, ওয়েস্ট কোট, সোয়েটার গেঞ্জির গোলক-ধাধার মধ্যে কোথায় যে পৈতে-গাছটা হারালো, কিছুতেই খুঁজে পেলুম না। বামুনের ছেলে, বিপদে আপদে, বিদেশ বিভুঁয়ে যজ্ঞোপবীতটাই মস্ত সহায়! সেটাও শেষে খোওয়ালুম!

সেই অন্ধকারে আমার যেন হাঁপ ধরতে লাগলো। অন্ধকার যে জাঁতাকলের মত মানুষের বুককে এমন ক'রে পিষতে থাকে এ আমি জানতুম না? আমি গাড়ীর মধ্যে এদিক্ ওদিক ক'রে ছট্‌ফট্ করতে লাগলুম, কানে কাদের সব ফিস্ ফিস্ কথা এসে লাগতে লাগলো। কোথাও একটু আলো পাই? আমি ছুটে গাড়ি থেকে বেরিয়ে রেলের লাইন থেকে নুড়ীপাথর তুলে ঠক্ ঠক্ ক'রে সজোরে ঠুকতে লাগলুম—যদি একটু আলোর ফিন্‌কি পাই। কিন্তু হায় অদৃষ্ট, আলোর

বদলে পাথরের কুচির ফিন্‌কি এসে আমার চোখ-ছুটোকে ঝন্‌ঝনিয়ে দিলে।

আমি ছু-হাতে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে স্টেশনের দিকে ছুট দিলুম, যেমন ক'রে পারি, সেখান থেকে একটা আলো নিয়ে আসব। ষ্টেশন-মাষ্টারটা কি পাজি? এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে আমায় একা ফেলে গেল, একটা আলো দিল না! বল্লে কি না, দিব্যি ঘুমতে ঘুমতে যাবেন! পাজি কোথাকার!

আমি ছুটতে ছুটতে একেবারে ষ্টেশনের কাছে এসে হাঁপ নিয়ে দাঁড়ালুম—প্লাটফর্মের—কিনারায় যে একটা বাঁকা খেজুরগাছ ছিল, ঠিক তার সাম্‌নে। কিন্তু এ কি? এই তো সেই খেজুরগাছ, এই তো এই তো রয়েছে। কিন্তু ষ্টেশন কোথায়? আমি এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ চেয়ে দেখলুম ষ্টেশন নেই। মনে হলো, কালো শ্লেটের গা থেকে ছেলেরা যেমন তাদের আঁকা ছবিগুলো মুছে ফেলে, ঠিক তেমনি ক'রে অন্ধকারের গা থেকে ষ্টেশনকে একেবারে কে মুছে ফেলেছে।

আমার বুক্‌টা ধ্বক্ ক'রে উঠলো। আমি আর তিলমাত্র না দাঁড়িয়ে আবার ছুটলুম—যে-পথে এসেছিলুম, সেই পথে আমার গাড়ির দিকে টপাটপ্ পাঁচ-ছয়টা লাইন টপ্‌কে ছুটতে ছুটতে আমি যখন সেই মাঠের ধারে আমার গাড়ির সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম, তখন দেখি অতবড় গাড়িখানা নিয়ে কে উধাও হয়েছে। গাড়ির চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। কি সর্বনাশ!

আবার ভালো ক'রে চারিদিক্ চেয়ে দেখলুম—ষ্টেশনও নেই, গাড়িও কোথায়? করি কি! একবার মনে হলো, যাই, আর একবার গিয়ে ভালো ক'রে ষ্টেশনটা খুঁজে আসি। কিন্তু ষ্টেশনের দিকটার সেই খাঁ-খাঁ মূর্তি মনে হয়ে আমার বুকটা ছ্যাং ক'রে উঠলো! ছেলেবেলায় গল্পে শুনতুম, দৈত্যদানারা রাতারাতি বড়-বড় বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আবার সকালে যেখানকার বাড়ি সেইখানে রেখে যেতো—

একি তাই হলো নাকি? মনে তো বিশ্বাস হয় না! কিন্তু চোখে তো দেখছি তাই!

হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠে মনে হলো, এমন ক'রে রেল-লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা তো ঠিক নয়—আচম্‌কা একখানি গাড়ি এসে চাপা দিয়ে যেতে পাবে! যেই এই কথা মনে হওয়া, তাড়াতাড়ি লাইন থেকে সরে অন্যদিকে ছুটে গেলুম! কিন্তু যেদিকে যাই, সেইদিকেই রেলের লাইন, সামনে পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, যে দিকে ছুটি, সেইদিকেই দেখি রেলের লাইন লোহার জাল দিয়ে আমায় ঘিরে ফেলেছে—পালাবার উপায় আর নেই! আমার এই ছুটোছুটি দেখে অন্ধকার থেকে কারা যেন হঠাৎ খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। আমি চম্‌কে উঠে থেমে দাঁড়াতেই টাল সামলাতে না পেরে একেবারে বাঁধের উপর থেকে গড়াতে গড়াতে নীচে এক গাছতলায় এসে পড়লুম। মনে হলো প্রাণটা যেন বাঁচলো! ট্রেন-চাপা পড়বার আর ভয় নেই।

গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে রইলুম। মনে হ'তে লাগলো কতক্ষণে রাত্রিটা কাট্‌বে। কিন্তু রাত্রির যেন আর শেষ নেই। বসে বসে দেখতে লাগলুম, নিস্তব্ধরাত্রি ঝিম্-ঝিম্ করতে করতে আরো নিঝুম চিকের ডানার মতো একখানা কালো কুৎসিত কম্বল আস্তে আস্তে টেনে মুড়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর গা থেকে একে একে সব জিনিস যেন মুছে আসছে। দেখতে-দেখতে আমি শুদ্ধ যেন মুছে আসতে লাগলুম। কালো জুতো-মোজা পরা আমার লম্বা পা দুখানা একটু একটু ক'রে মুছে গেল। কালো ওভার কোট ও নীল বালাপোষ মোড়া-গা—তাও আস্তে আস্তে মুছতে লাগলো। যখন প্রায় কোমর অবধি মুছে গেছে, আমি আর সে দৃশ্য দেখতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেল্লুম। চোখ বুজে—মনে হতে লাগলো—আমি আছি কি নেই? আছি কি নেই?

"আছে আছে—এইখানে আছে।" ব'লে কানের কাছে কে একজন চীৎকার ক'রে উঠলো। আমি চোখ চেয়ে দেখি, মানুষের

দেহের মেদ-মাংস ছাড়িয়ে নিলে যেমন হয়, তেমনিতর একটা কঙ্কাল তার কাঠির মতো সরু সরু লম্বা আঙ্গুল নেড়ে ইসারা ক'রে কাকে ডাকছে। দেখতে দেখতে ঠিক তারই জুড়ি আর একটা কঙ্কাল লাফাতে লাফাতে তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

তারপর আর একটা।

দ্বিতীয় কঙ্কালটা আস্তে আস্তে সরে আমার খুব কাছে এসে ঘাড় হেঁট ক'রে আমাকে দেখতে লাগলো। তার চোখের ওপর চোখ পড়তে দেখলুম—না আছে পাতা, না আছে তারা, শুধু ছুটো গোল গোল গহ্বর কালো কট্‌কট্ করছে। সে আমাকে বেশ নিরীক্ষণ ক'রে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—"এই নাকি সে?"

প্রথম কঙ্কালটা বল্লে—"বেশ বেমালুম লুকিয়েছে তো, একেবারে চেনবার যো নেই।"

শেষ কঙ্কালটা ছুটে এসে বল্লে—"কৈ, দেখি।" ব'লে তার হাড় বার-করা আঙ্গুলগুলো দিয়ে টিপে টিপে আমায় দেখতে লাগলো।

"ও আর—দেখছিস কি? ও সে-ই! আমার চোখে কি ধুলো দেবার যো আছে—হাজারই লুকোক না।" ব'লে প্রথম কঙ্কালটা এতখানি হাঁ ক'রে বিরাট শব্দে হেসে উঠলো। মুখের ভিতর থেকে তার সেই সাদা সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে অন্ধকারকে যেন কামড়ে ধরলো!

শেষ কঙ্কালটা বল্লে—"তবু একটু পরখ করতে হবে না; ওদিকে লগ্ন বয়ে যায়।" ব'লে সে আমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি ভাবলুম ব্যস্, এইবার আমার শেষ!

দেখতে দেখতে বাকি-ছুটো কঙ্কাল এগিয়ে এসে আমার পা-ছুখানা ধরলে, প্রথমটা মাথার দিকটা ধরলে; তারপর তিনজনে মাটি থেকে চ্যাং-দোলা ক'রে আমার তুলে ফেল্লে। আমি তাড়াতাড়ি ছু-হাত দিয়ে গাছের গুঁড়িটা চেপে ধরে বলে উঠলুম—"কোথায় নিয়ে যান মশাই!"

তারা বল্লে—“বিয়ে দিতে।”

আমি চম্‌কে উঠে বল্লুম—“বিয়ে দিতে কি মশাই! এই বুড়ো বয়সে?”

একজন বল্লে—“বুড়ো বরই পছন্দ করি!”

আমি বল্লুম—“মশায় আমার চেয়ে ঢের বুড়ো আছে, তাদের কাউকে নিয়ে যান না, আমায় কেন মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছেন।”

প্রথম কঙ্কালটা চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো—“তুমি ভেবেছ, পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকলে রেহাই পাবে? তোমাকে আমরা জোব ক'রে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেবো।”

আমি বল্লুম—“আমি তো মশাই, পালিয়ে এসে লুকিয়ে নেই। সেই ছেলেবেলায় একবার পালিয়েছিলুম বটে; তাবপর তো জ্যাঠা-মশাই পুলিশ দিয়ে ট্রেন থেকে ধ'বে নিয়ে গিয়ে আমাব বিয়ে দেন।”

সে বল্লে—“আমবাও পুলিশ এসেছি, ধ'বে নিয়ে গিয়ে তোমার বিয়ে দেবো ব'লে।”

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বল্লুম—“কিন্তু আমি তো আব বিয়ে কবতে পারব না।”

“পাববে না কি? বিয়ে তোমায় করতেই হবে। এমন কি তোমাব গো?” ব'লে সেই পয়লা নম্বরের কঙ্কালটা ভীষণ গর্জন ক'রে উঠলো।”

আমি বল্লুম—“বাগ কবেন কেন মশাই? আমি ছাডা কি আব পাত্র নেই? এত ছেলে হয়তো খুসী হয়ে বিয়ে করবে।”

সে বল্লে—“কত বাত্রে এখন ভালো পাত্র পাই কোথায়? যার তার হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না,চল, লগ্ন বয়ে যায়।”

আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লুম—“তাহলে নিতান্তই কি আমাকে বিয়ে করতে হবে?”

শেষ কঙ্কালটা আমার কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে নরম সুরে বল্লে—“দুঃখ করছিস কেন ভাই ক্যাংলা?”

আমি তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লুম—"ক্যাংলা কে মশাই! আমি তো ক্যাংলা নই। আমি শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আমার পিতার নাম ৺মধুসূদন চক্রবর্ত্তী।"

প্রথম কঙ্কালটা হো-হো ক'রে হেসে উঠে বল্লে "রাধে মাধব! রাধে মাধব!"

আমি বল্লুম—"সে কি মশাই?"

সে বল্লে—"এই এতরাত্রে, এই শ্মশানের ধারে একটা জ্যান্ত শিয়াল কুকুব থাকে না, আব মাধব চক্রবর্ত্তী আছে? তুই এতই বোকা পেলি আমাদের?" আমি বল্লুম—"এই তো আমি বয়েছি।" সে বল্লে—"আবে ভাই, মাধব চক্রবর্ত্তীর দেহের ভিতর আবার কে এলো?"

সে বল্লে—"আরে ক্যাংলা, তুই মাধব চক্রবর্ত্তীর শূন্য দেহের মধ্যে সেঁধিয়ে আছিস, সে কি আমি টের পাইনি ভেবেছিস?"

আমি বল্লুম—"এসব কি হেঁয়ালি বকছেন মশাই? মাধব চক্রবর্ত্তীর দেহেব মধ্যে যদি ক্যাংলা এলো, তো মাধব চক্রবর্ত্তী গেল কোথা?"

সে বল্লে—"আরে ভাই, বামুনের ছেলে সে, বৈকুণ্ঠে গেছে।"

আমি বল্লুম—"না মরেই সে বৈকুণ্ঠে গেল?" সে বল্লে—"মরেছে না তো কি?"

আমি বল্লুম -"মরেছে কি রকম! সে মরে গেল আব টের পেলে না?"

সে বল্লে—"মানুষ কখন জন্মায় আর কখন মরে সে তা টের পায় না কি!"

কথাটা শুনে বোঁ ক'রে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। আমার অজান্তে আমি মরে গেলুম না কি, অ্যাঁ? সেই যে দেখলুম পৃথিবীর গা থেকে একে একে সব মুছে আসছে -সেই কি আমার মৃত্যু নাকি? কিন্তু এই তো আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। তা বটে। কিন্তু তবু কেমন সন্দেহ হতে লাগলো। হয়তো এ আমি নই—এ আর কার আত্মা

আমার শূন্য শরীর দখল করেছে। নইলে এই কঙ্কালগুলোর সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইতে পারতুম? জ্যান্ত মানুষ কি কখনো তা পারে? কিন্তু মরে গেলুম কেমন ক'রে? আমার তো রোগ হয়নি। হয়তো ঐ বাঁধেব উপব থেকে গড়িয়ে পড়ার সময় পাথরে মাথা লেগে আমার মৃত্যু হয়েছে—আমি টের পাই নি।

ভাবতে ভাবতে আমাব মাথা গুলিয়ে যেতে লাগলো। কেমন মনে হ'তে লাগলো—না, আমি মাধব চক্রবর্ত্তী নই। এবং ঠিকই বলেছে —কাঙালীচরণের আত্মা আমার শূন্য দেহের মধ্যে এসে আসন পেতে বসেছে। তাইতো আমার দেহের ভ্রম হচ্ছে, মাধব চক্রবর্ত্তীর জের বুঝি এখনো চল্‌ছে, কিন্তু কাঙালীচবণ লোকটা কে? আমি যদি কাঙালীচবণ হব, তবে আমি আমাকে চিন্‌তে পারছি না কেন? এরা তো চিন্‌তে পেরেছে।

প্রথম কঙ্কালটা ব'লে উঠলো—"কি হে ক্যাংলা, কি ভাব্‌ছ? বিয়ে কববার মতি স্থির হলো।" আমি বল্লুম—"আচ্ছা মশাই, আমি কি সত্যি কাঙালীচরণ?"

সে খানিক আমার মুখেব দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে বল্লে—"সে কিরে ক্যাংলা, তুই নিজেকে নিজে চিন্‌তে পারছিস্ না?"

আমি বল্লুম—"না।"

সে বল্লে—"সর্ব্বনাশ হয়েছে! তুই আমাদেরও চিনতে পারছিস না?"

আমি বল্লুম—"একটুও না।"

সে বল্লে—"তোর মনে পড়ছে না—আজ এই অমাবস্যার দিনে, ঘুটঘুটে লগ্নে তোর বিয়ে—বাগেশ্বরীর সঙ্গে?"

আমি বল্লুম—"কৈ আমার তো কোন বিয়ের কথা হয়নি।" সে বল্লে—"সে কিরে! তোর গায়ে-গোবর পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, মনে পড়ছে না?"

আমি বল্লুম—"গায়ে-গোবর কাকে বলে?"

সে বল্লে—"তুই অবাক করলি। তোর কিছু মনে পড়ছে না? গায়ে-গোবরের দিন ভোর রাত্রে তালপুকুরে তুই মাছ মারতে যাচ্ছিলি তত্ত্ব পাঠাবার জন্যে, তালগাছের মাথায় বসে পা ঝুলিয়ে বাগেশ্বরী বরপণের কড়ি বাচছিল, তুই বাগেশ্বরীকে দেখ্‌তে পাস্‌ নি, সেও তোকে দেখতে পায়নি, তারপর তুই যেমন ঠিক তালগাছের তলাটিতে এসেছিস্‌, অমনি বাগেশ্বরীর পা দুটো দুলতে দুলতে তোর কপালে এসে ঠক্‌ ক'রে লেগে গেল। বাগেশ্বরী তো লজ্জায় সাত হাত জিভ্‌ কেটে, মাথায় ঘোমটা টেনে দৌড়। আর তুই বাড়িতে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে বল্লি ও-মেয়েকে আমি বিয়ে করব না। কেন রে, কেন কি হয়েছে? তুই বল্লি,--ওর পা আমার কপালে ঠেকেছে। তাতে হয়েছে কি? তুই বল্লি—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। ব'লে তুই—কপাল চাপড়াতে লাগলি! এ সব তোর মনে পড়ছে না?"

আমি বল্লুম—"মনে পড়ছে, এই রকম একটা গল্প যেন কোথায় শুনেছিলুম। তারপর কি হলো?"

সে বল্লে—"সর্বনাশ করলি। তারপরেও তোর মনে পড়ছে না? তারপর তো গুরুঠাকুর এলেন; এসে বিধান দিলেন যে, বাগেশ্বরীর পা তোর মাথায় একবার ঠেকেছে, তুই-সাত—একে—সাতশোবার তোর পা দিয়ে তার মাথাটা থেঁৎলে দে, তা হ'লেই সব দোষ খণ্ডে যাবে। তুই বল্লি ওরে বাপরে; বাগেশ্বরীর মাথায় লাথি-মারা; সে আমি পারব না;—ব'লে তুই ছুট্‌ দিলি।"

আমি বল্লুম—"তারপর?"

সে বল্লে—"তারপর আজ বিয়ের সময় তোকে খুঁজে না পেয়ে, খুঁজতে খুঁজতে এই শ্মশানঘাটে এসে দেখি, তুই এই মাধব চক্রবর্ত্তীর মড়াটাকে দানা পাইয়ে বসে আছিস্‌। হাঁরে, এই মাধব চক্রবর্ত্তীকে যারা পোড়াতে এসেছিল, তারা গেল কোথায়; তোকে দেখে ভয়ে পালিয়েছে বুঝি?"

আমি বল্লুম—"মাধব চক্রবর্ত্তীকে আবার পোড়াতে আসবে কারা? আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না?"

সে বল্লে—"তোর কিছুই মনে পড়ছে না? তুই সত্যি বলছিস, না মস্করা করছিস?"

আমি বল্লুম—"তোমার দিব্যি, আমি সত্যি বলছি।" সে বল্লে—"তবে সর্ব্বনাশ হয়েছে—তোকে মানুষে-পেয়েছে।"

আমি বল্লুম—"মানুষে পেয়েছে কি গো!"

সে বল্লে—"জানিস্ না বুঝি, আমরা যেমন মানুষের ঘাড়ে চাপি, মানুষও তেমনি আমাদের কারো কারো ঘাড়ে চাপে। তুই যখন মাধব চক্রবর্ত্তীর দেহে সেঁধিয়েছিলি, তখন বোধ হয় তার একটুখানি প্রাণ ছিল, সেইটে তোকে পেয়ে বসেছে।"

আমি বল্লুম—"তাতে কি হয়?"

সে বল্লে—"মানুষ যেমন তখন নিজেকে চিন্‌তে পারে না, আপনার লোককে চিন্‌তে পারে না, আবোল তাবোল বকে, কট্‌মট্ করে চোখ ঘুরোতে থাকে, আমাদেরও ঠিক তেমনি হয়। তাই তো তুই অমন করছিস্—নিজেকে চিনতে পারছিস্ না, আমাদেরও চিন্‌তে পারছিস্ না।"

"ওগো, তবে আমার কি হবে?"

সে বল্লে—"যেমন বিয়ে করব না বলে পালিয়ে এসেছিস্, তেমনি ঠিক জব্দ।"

আমি বল্লুম—"ওগো, আমি বাগেশ্বরীকে বিয়ে করবো—আমাকে উদ্ধার করো।"

সে বল্লে—"তবে বেরিয়ে আয় ওখান থেকে।"

আমি বল্লুম—"বেরুব কি ক'রে গো?"

সে বল্লে—"পথ হারিয়ে ফেলেছিস্ বুঝি? মুশ্‌কিল করলি দেখছি! এক কাজ কর। মাধব চক্রবর্ত্তীর ঐ কোঁচার খুঁট্‌টা এই গাছের ডালে বেঁধে গলায় একটা ফাঁস দিয়ে তুই ঝুলে পড়—তাহলেই সুড়ুং ক'রে বেরিয়ে আসতে পারবি।"

আমি আঁৎকে উঠে বল্লুম "ওরে বাপরে—সে যে ফাঁসি। সে আমি পারব না।"

সে বল্লে—"ভয় কি! আমি তো কতবার ফাঁসি গেছি! তোব কোনো ভয় নেই, তুই ঝুলে পড়।"

আমি ভয়ে শিউরে উঠে বল্লুম—"না গো, না—সে আমি পাবব না। গলায় ফাঁসি দিতে কিছুতেই পারব না।"

যেমন এই কথা বলা, সেই প্রথম কঙ্কালটা তার সেই কালো গর্ত্তের মত চোখ দুটোকে বন্ বন্ ক'রে ঘুরিয়ে বল্লে "কী তুই ফাঁসি যেতে পারবি না! আমরা হলুম গলায়-দড়ে! তুই আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে, এমন কথা বলিস্ যে, ফাঁসি যেতে তোর ভয় হয—কুলাঙ্গার কোথাকার।"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বল্লুম—"কি করব, আমার যে ভয় করছে!"

সে দাঁতের দু'পাটি কড়মড় করতে করতে বলে উঠলো—"ফের ঐ কথা! এই বেলা ঝুলে পড়, নইলে তোর ভালো হবে না বলছি।"

আমি বল্লুম—"ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি ফাঁসিতে ঝুলতে পারব না—আমার ভয় করছে।"

সে আরো রেগে বল্লে—"হতভাগা কোথাকার! দূর হ, আমাদের সামনে থেকে দূর হ।" ব'লে সে তেড়ে আমায় মারতে এলো।

দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"রাগ কবেন কেন খুড়ো মশাই। ও হয় তো ক্যাংলা নয়? নইলে ফাঁসিতে ভয় পাবে কেন?"

খুড়ো মশাই বল্লেন—"কী! ক্যাংলা নয় ও? আমি সাত বচ্ছর টিক্‌টিকি পুলিশে কাজ করেছি, কত বড় বড় ফেরার পাকড়াও করেছি-আমার ভুল হবে?" শেষ কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন একবার পরখ ক'রে দেখতে ক্ষতি কি দাদামশাই?"

দাদামশাই বল্লেন,—"আচ্ছা কেন, পরীক্ষা হোক্।" বলে

আমার দিকে ফিরে বল্লেন—"কি হে, তুমি মাধব চক্রবর্ত্তী না কাঙালীচরণ!"

আমি বল্লুম—"আজ্ঞে, আগে তো জানতুম আমি মাধব চক্রবর্ত্তী, কিন্তু তারপর থেকে মনে হচ্ছে কাঙালীচরণ।" সে বল্লে—"কাঙালী-চরণ যদি হও, তুমি আমার অবাধ্য হয়েছ ব'লে তোমায় ফাঁসি দেবো আমরা, এই শ্মশানে এই গাছের ডালে!"

আমি বল্লুম—"আজ্ঞে আমি তবে মাধব চক্রবর্ত্তী", সে বল্লে—"বেশ মাধব চক্রবর্ত্তী ব'লে যদি নিজেকে প্রমাণ করতে পার, তাহলে তোমায় তিনবার সেলাম ঠুকে আমরা চলে যাবো।"

"আর যদি না পারি?"

"তা হ'লে এইখানে তোমার ঘাড় মট্‌কে রেখে চলে যাবো।"

"ঘাড় মট্‌কে দেবেন? সর্বনাশ! এই বিদেশ বিভুঁয়ে—এই অচেনা জায়গায় এত রাত্রিতে নিজেকে কি ক'রে প্রমাণ করবো মশাই?"

"না পার, ঘাড়টি মট্‌কে দেবো—শ্মশানের ভূত হয়ে থেকো।"

সত্যি বলছি, এই কথা শুনে আমি কেঁদে ফেল্লুম। তখন সেই দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"কাঁদছ কেন? তোমার এমন কোনো চিহ্ন নেই, যাতে প্রমাণ হয়, তুমি মাধব চক্রবর্তী?"

আমি বল্লুম—"আছে। এই দেখুন, আমার ডানহাতে একটা জড়ুলের দাগ।"

সে হেসে বল্লে—"ও প্রমাণ তোমাদের পুলিশের কাছে চলে, এখানে আমাদের কাছে চলে না। কোন ভিতরের প্রমাণ দিতে পার?"

আমি বল্লুম—"আমার ভিতর কি আছে না আছে, আমি তো জানি না মশাই। এই দেখুন না আমার ভিতরে কাঙালীচরণ আছে কি মাধব চক্রবর্ত্তী আছে, আমি তাই ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।"

প্রথম কঙ্কালটা গম্ভীরস্বরে ব'লে উঠল—"আজ্ঞে না, না, আমি মাধব চক্রবর্ত্তী।"

সে বল্লে—"শীগগির প্রমাণ কর, নইলে ঘাড় মট্‌কালুম ব'লে।"

দ্বিতীয় কঙ্কালটা বলে—"অমন ঘেবড়ে যাচ্ছ কেন? তোমার কি এমন কোন গুণ নেই যাতে বোঝা যায় তুমি মাধব চক্রবর্ত্তী।"

আমি ব'লে উঠলুম—"হ্যাঁ, আছে বৈ কি! আমার একটা মস্ত গুণ আছে, আমি কবিতা লিখতে পারি।"

প্রথম কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"তুমি কবিতা লিখতে পার? নিজে লেখ? না পরের কবিতা নিজের ব'লে চালাও?"

আমি বল্লুম—"না মশাই, আমি সে-রকম কবি নই।" সে বল্লে—"তোমার কবিতা কাগজে ছাপা হয়?"

আমি বল্লুম—"না, সম্পাদকরা ভয়ে ছাপেন না।" সে বল্লে—"ভয়ে ছাপেন না কি রকম?"

আমি বল্লুম—"আমার কবিতা এত উচ্চশ্রেণীর যে, একবার সে কবিতা ছাপলে পাঠকরা অন্য কবিতা পড়তেই চাইবে না। কাগজ ভর্ত্তি করা তখন দায় হয়ে উঠবে। এ কথা এক সম্পাদক আমায় নিজের মুখে বলেছেন।"

সে বল্লে—"আচ্ছা! কৈ দেখি, একটা কবিতা লেখ দিকিনি।"

আমি তখনই ওভারকোটের পকেট থেকে আমার পকেটবইখানা বার ক'রে বললুম—"আলো একটা চাই যে।"

সে বল্লে—"দিচ্ছি আলো।" ব'লে খানিকটা ধুলো বালি একত্র করে একটা ফুঁ দিলে, আর অমনি আগুন জ্বলে উঠলো। আমি সেই আলোয় বসে লিখতে লাগ্‌লুম।

খানিকটা লিখেছি, সে বল্লে—"কৈ, কি লিখলে পড়।" আমি বল্লুম—"এখনও যে শেষ হয় নি মশাই।" সে বল্লে—"কবিতার আবার শেষ আছে না কি? যা লিখেছ পড়—ফাজলামি করতে হবে না।" আমি সুর ক'রে পড়লুম—

"পড়িয়ে বিপদে তারা,
হয়েছি মা দিশে হারা !
উদ্ধার এ-দুঃখ-কারা
পাব হ'তে মা জননী
শ্মশানে বসিয়ে ডাকি,
ভয়ে ঘোরে শিব-চাকি,
খাবি খায় প্রাণ-পাখী,
শূন্য হেরি এ ধরণী
কোথা মোর গেহ-খাঁচা,
কোথা পিতা, কোথা চাচা,
এসে মা, আমারে বাঁচা,
দিয়ে তোর পা-তরণী !"

এইটুকু শেষ হ'তেই সে বল্লে—'ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। এ-রকম গান তো আমি অনেক যাত্রায় জুড়িদের মুখে শুনেছি। এ তোমার নিজের লেখা না, পুরানো গান একটা মুখস্থ ছিল, তাই লিখে শোনাচ্ছ ?"

আমি বল্লুম "না মশাই, এ আমার নিজের রচনা। একেবারে টাট্কা। এতে আপনি পুরোনোর গন্ধ কোথায় পেলেন ? দেখছেন না, একেবারে আধুনিক ধরনের লেখা।"

সে বল্লে—"থাম, তোমায় আর জ্যাঠাপনা করতে হবে না। পুরোনো একটা গান চুরি ক'রে নিয়ে আমায় ফাঁকি দেবে ভেবেছে ? তা হচ্ছে না। দেখি তুমি কত বড় ওস্তাদ—আমার নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখতে পার ?" আমি বল্লুম—"খুব পারি। নাম দিয়ে আমি অনেক কবিতা লিখেছি। তেলের নাম দিয়ে, ওষুধের নাম দিয়ে অনেক ভালো ভালো কবিতা আমার লেখা আছে। একবার একটা জুতোর দোকানের কবিতা লিখে প্রাইজ পেয়েছিলাম। আপনার নামটা কি বলুন, আমি এখনি লিখে দিচ্ছি।"

সে বল্লে—“আমার নাম জাঁদরেল। লিখে ফেল দেখি এই নাম দিয়ে একটা কবিতা চট্ ক'রে। বুঝব কত বড় বাহাদুর তুমি।”

আমি কাগজ-পেন্সিল নিয়ে লিখতে সুরু করেছি মাত্র, সে বল্লে—“কি লিখলে, পড়হে। আমিও বড় কবিতা দু-চক্ষে দেখতে পারি না।”

আমি বল্লুম—“মশাই, আর একটু সময় দিন।” ব'লে আমি খস্ খস্ শব্দে লিখে যেতে লাগলুম। একবার একটু থেমেছি, সে আমার খাতার দিকে ঝুঁকে দেখে বল্লে—“উঃ, অনেকটা লেখা হয়েছে। এইবার পড়।”

অগত্যা আমি পড়লুম—

“রেল আছে, জেল আছে,
আর আছে কৎবেল ;
পাস আছে, ফেল আছে,
আর আছে শূল শেল্
ঢোল আছে, চোল আছে,
আর আছে সরখেল
সব সে বড়া হ্যায়
জাঁদরেল জাঁদরেল”

পড়া শেষ হ'তেই সে চীৎকার ক'রে উঠলো—“বাঃ, বাঃ, বেড়ে লিখেছ তো হে। আর একবার পড় তো, আর একবার পড় তো।”

আমি আর একবার চিৎকার করে পড়লুম—“রেল আছে, জেল আছে, ইত্যাদি।”

সে আবার বল্লে—“বেশ হয়েছে! চমৎকার হয়েছে! যাও, প্রমাণ হয়ে গেল তুমি কবি মাধব চক্রবর্ত্তী।”

আমি বল্লুম—“ঠিক বলছেন মশাই, আমি কাঙালীচরণ নই!” সে বল্লে—“কাঙালীচরণের চৌদ্দপুরুষ এমন কবিতা লিখতে পারে না। মাধব চক্রবর্ত্তী না হ'লে এমন কবিতা লেখে কে?” আমি বল্লুম—“মশাই, আমার আর একটা কবিতা শুনবেন? এই খাতায় লেখা

আছে—এই জয়পুরের সম্বন্ধে।" সে বল্লে—"কৈ, শোনাও তো দেখি।"

আমি তাড়াতাড়ি পকেট বইয়ের খাতা হাত্‌ড়ে কবিতাটা বার ক'রে পড়তে শুরু করলুম—

"বস্তা-বস্তা পুঞ্জ পুঞ্জ তীব্র হিম ঢেলে
ব্যোম-মার্গে কে রচিল শীতের পাহাড় ?
লেপ-গদি বালাপোষ সর্ব্ব বর্ম ভেঙে
কম্প এসে কাঁপাইছে শরীরের হাড়।
ঊর্দ্ধ-ফণা ক্রুদ্ধ শত নাগিনীর প্রায়
কপালে-কপোলে ভীম হানিছে ছোবল,
কিম্বা কোন্ পিশাচিনী উন্মাদিনী-সমা
তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় করিছে কোতল!
অথবা কি মেঘ-দৈত্য ছোঁড়ে শার্পনেল—"

হঠাৎ দূরে একটা বীভৎস কোলাহল উঠলো—"ওরে ক্যাংলাকে পাওয়া গেছে।"

আমি চম্‌কে উঠে পড়া থামিয়ে চেয়ে দেখি আমার সামনের কঙ্কাল তিনটে লাফাতে লাফাতে ডিগ্‌বাজি খেতে খেতে মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি "রাম! রাম!" বলতে বলতে সেখান থেকে উঠে পড়লুম। এতক্ষণ রাম নামটা যে কেন মনে আসে নি, কে জানে ?

আমি রেল-লাইনের বাঁধ ঠেলে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় দুটো কুলির সঙ্গে দেখা। তারা বল্লে—"বাবু, আপনাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি গাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন ?"

আমি আর কি বল্‌বো ? বল্লুম—"আমি এখানে ঐ ইয়ে হচ্ছিল কি না, তাই একটু দেখছিলুম।" তারা বল্লে "আপনার গাড়ি ঠেলে আমরা ঐ ওদিকে রেখে দিয়েছি। চলুন আপনাকে দেখিয়ে দিই।" ব'লে তারা আমাকে গাড়িতে তুলে দিলে।

আমি গাড়িতে ওঠে বল্লুম—"হাঁরে, গাড়িতে আলো নেই কেন ?"

সে বল্ল—"বিজ্‌লিবাতি আছে, মেল গাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে দিলে তবে জ্বলবে।"

আমি বল্লুম—"আমাকে একটা বাতি দিয়ে যেতে পারিস্?—বখশিশ্ দেবো।"

তাদের একজন ছুটে গিয়ে একটা বাতি এনে দিলে। আমি সেইটে সামনে রেখে পকেট-বই খুলে নিজের লেখা কবিতা পড়তে লাগলুম।

●

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

মেটাজীর সঙ্গে আমার পরিতোষের আর কালিচরণের দেখা হ'ল।

লোকটি দেখতে বেশ লম্বা-চওড়া ধপধপে ফরসা, পরনে ধুতি অথচ মাথায় পারশীদের মতন টুপি অথবা ডোঙার মতন একটা বস্তু। বোঁ বোঁ ক'রে বাংলা বলেন।

কিছু দূরে কল্যাণ স্টেশনের কাছে পুনার এক শেঠ গভর্মেণ্টের কাছ থেকে একটা জঙ্গল কিনেছেন। খুব সুন্দর জঙ্গল—পাহাড়-ঝরনা ইত্যাদিও আছে। কল্যাণ থেকে পুনায় যেতে হলে যে সব জঙ্গল পাহাড ভেদ ক'রে যেতে হয় তারই খানিকটা আর কি! এই জঙ্গল কেটে সাফ ক'রে তিনি এখানে চাষবাস করছেন। সামান্য খানিকটা জায়গা সাফ ক'রে আপাতত চাষবাস শুরু করেছেন, পরে আস্তে আস্তে বাড়াবেন। দুই একজন লোক এই জমির খানিকটা ক'রে ভাড়া নিয়ে নিজেরাও চাষবাস করছে। যাই হোক, এখানে নানা কাজের জন্য বিস্তর লোক খাটছে, মেটাজী সেখানে কিছু কাজ যোগাড় ক'রে দিতে পারেন।

বলা বাহুল্য, আমরা তো তখুনি রাজী হয়ে গেলুম। মেটাজী বললেন—আমি শীগ্গিরই সেখানে গিয়ে তোমাদের জন্য সব বন্দোবস্ত ক'রে আসব।

এরপর আমরা রোজই খোঁজ নিই, কিন্তু শুনি যে, মেটাজীর সেখানে যাবার সুবিধা হয়নি।

প্রায় দিন পনরো পরে একদিন বললেন—কাল সকালে নিয়ে যাবেন।

সংবাদটি পেয়ে আমরা যে কিরকম আনন্দিত হয়েছিলুম তা বোধ হয় না বললেও চলবে। উৎসাহের আবেগে রাত্রে আমাদের ভালো ক'রে ঘুমই হল না। খুব ভোরে উঠে স্নান ক'রে চা খেয়ে এলুম। তারপরে আমাদের ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলিগুলি বেঁধে উপস্থিত হলুম।

যথা সময়ে কল্যাণে নেমে কিছুক্ষণ হেঁটে সেই জঙ্গলে এসে পৌঁছানো গেল। সামনের দিকটা অর্থাৎ যেদিকটা লোকালয়ের দিকে সেদিক থেকে আরম্ভ ক'রে ভেতরের প্রায় আধ-মাইলটাক লম্বা ও আধ মাইলটাক প্রস্থ জমি পরিষ্কার ক'রে আবাদ করা হচ্ছে। আমরা জঙ্গলে ঢুকে সরু রাস্তা দিয়ে খানিকটা ভেতরের দিকে গিয়ে একখানা পাতা-দিয়ে ছাওয়া ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম।

মেটাজী উচ্চৈঃস্বরে কয়েকবার কি একটা ব'লে চিৎকার করতেই ঘরের ভেতর থেকেই জবাব দিয়ে বেরিয়ে এল একজন বেঁটে-মতো বেশ গুণ্ডা-গোছের লোক, হাঁটুর ওপরে মালকোঁচা-মারা ধুতি পরা, গায়ে একটা ফতুয়া-গোছের হাতকাটা জামা। জামাটার সামনের দিকে একটা বড় তাপ্পি-পকেট।

লোকটা কাছে এসে একবার আমাদের আপাদমস্তক দেখে তারপর মেটাজীর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল।

কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন আর আমরা তিনজনে তাঁদের পশ্চাদনুসরণ করতে লাগলুম।

জঙ্গলের মধ্যে কিছুদূর গিয়ে বিরাট একটা ফাঁকা জায়গায় উপস্থিত হলুম। দেখলুম, একদিকে অনেকখানি জায়গা নিয়ে কলার বাগান করা হয়েছে। বেঁটে কলাগাছ—তাতে কাঁদি-ভর্তি বড় বড় মোটা কলা গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে ঠেকেছে। আরও খানিকটা এগিয়ে দেখা গেল সেখানে চিচিঙ্গের ক্ষেত করা হয়েছে—তিন চার হাত লম্বা হাজার হাজার চিচিঙ্গে উঁচু মাচা থেকে মাটির দিকে ঝুলছে। বড় বড় মানুষের সমান উঁচু ঘাসের জঙ্গল দু'হাতে সরিয়ে তার মধ্যে রাস্তা ক'রে মেটাজী ও ভুলু সর্দার আগে চলেছেন—তাঁদের পেছনে আমরা

চলেছি। সম্মুখে পিছনে আশেপাশে মোটা মোটা বড় বড় গাছ—সে-সব গাছের চেহারাও কখনো দেখিনি, নামও শুনিনি। এইসব গাছে জাহাজের কাছির মতন মোটা ও শক্ত পাকানো পাকানো লতা ঝুলছে। কোনো কোনো জায়গায় জঙ্গল এত ঘন যে, গাছের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে আছে। কতদিন যে সেখানকার জমিতে সূর্যালোক স্পর্শ করেনি, তার ঠিকানা নেই। জায়গাটা একেবারে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। এক জায়গায় দেখলুম, অনেকখানি জমি পরিষ্কার ক'রে লাঙল দিয়ে চষা হয়েছে—প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন স্ত্রী-পুরুষে মিলে সেই জমি থেকে আগাছা ও পাথর ইত্যাদি বেছে এক জায়গায় জড়ো করছে।

আমরা আসতেই তারা দাঁড়িয়ে উঠে অবাক হয়ে আমাদের দেখতে লাগল। পুরুষগুলির গায়ে কোনো জামা নেই, কোমরে একখণ্ড বস্ত্র জড়ানো, তাতে কোনোরকমে লজ্জা নিবারণ হয়েছে মাত্র। মেয়েদের দেহের উপরার্ধ একরকম নগ্ন বললেই চলে। কোমরে একটু বস্ত্র জড়িয়ে রেখেছে। পুরুষ কিংবা স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত রোগা। পুষ্টিকর খাদ্য তো দূরের কথা, দেখে মনে হয়—কোনো রকমের খাদ্য তাদের পেটে পড়ে কি না সন্দেহ। সকলেই অদ্ভুত একরকমের দৃষ্টিতে বিশেষ ক'রে আমাদের তিনজনকে দেখতে লাগল।

এইখানে মেটাজী পেছনে ফিরে দাঁড়িয়ে আমাদের বললেন - এই এদের সঙ্গে তোমাদের কাজ করতে হবে। কাজ এমন হাতী ঘোড়া কিছুই নয়—একটা বাচ্চা ছেলেকে বললেও সে করতে পারে।

এই অবধি ব'লে আবার তাঁরা কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন। আমাদের সামনে ও পেছনে বিস্তীর্ণ অরণ্য, দক্ষিণে ও বামে ছোট পাহাড়ের সারি। মনে হয় যেন প্রকৃতিদেবী জঙ্গলের দুদিকে উঁচু পাথরের দেওয়াল গেঁথে রেখেছেন। এক এক জায়গায় জঙ্গল সংকীর্ণ হয়ে গেছে - দু'দিকের পাহাড় অনেক কাছাকাছি হয়েছে। দেখলুম প্রায় সর্বত্রই এই পাহাড়ের গা বেয়ে নিরন্তর জল

ঝরছে—তারই ফলে পাহাড়ের গায়ে শেওলা জন্মেছে। কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় দেখা গেল একখণ্ড প্রকাণ্ড পাথর—তারই ওপর দিয়ে একটা শীর্ণ জলধারা এসে নিচে একটা ডোবার মতন সৃষ্টি হয়েছে। মেটাজী আমাদের বললেন—এই দেখ কেমন সুন্দর ঝরনা। এরা এই জল খায়।

আরও কিছুদূব অগ্রসর হবার পর মনে হল যেন এতক্ষণে আমরা গভীব জঙ্গলেব মধ্যে এসে পড়েছি। ছোট-বড় গাছ ও লতায় মাথার ওপর চাঁদোয়ার মতন একটা আচ্ছাদন সৃষ্টি হওয়ায় জায়গাটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকাব ও নির্জন ব'লে মনে হতে লাগল। এখানকার পথও পরিষ্কার নয়, বেশ বুঝতে পারা গেল যে এদিকে লোকজন বড় একটা কেউ আসে না।

এই দিকে খানিকটা এগিয়ে যাবার পব দূরে একটা বাড়ি দেখতে পাওয়া গেল।

মেটাজী পেছন ফিরে আমাদের বললেন—ঐ দেখ তোমাদের বাড়ি। এমন জায়গায় এমন সুন্দর বাড়িতে লাটসাহেবও থাকতে পায় না।

একটু এগিয়েই আমরা বাড়ির কাছে এসে উপস্থিত হলুম। আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রায় দশ-বারোজন নারী ও পুরুষ শ্রমিক যে আমাদের অনুসরণ করছিল তা আমরা টেবই পাইনি। এইখানে এসে দাঁড়াতেই তারা আরও কাছে এগিয়ে এসে আমাদের ভালো ক'রে দেখতে লাগল, কিন্তু সর্দার রক্তচক্ষু বার ক'রে বিকট চিৎকার করে তাদের ভাষায় কি সব বলায় সকলেই ধীরে ধীরে ফিরে চলে গেল। সর্দার মহাশয়ের এই বিকট আওয়াজ শুনে তাঁর মেজাজের কিছু পরিচয় পাওয়া গেল, তিনি ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে অর্থাৎ আমরা যাতে বুঝতে পারি—মেটাজীকে বললেন—শুয়ারের বাচ্চারা অত্যন্ত পাজি শয়তান এবং অসম্ভব রকমের চালাক। আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভুলে ডাণ্ডাটা ফেলে এসেছি—হাতে ডাণ্ডা নেই—বুঝতে

পেরেছে যে, এখন আর মারতে পারবে না—অমনি আমাদের পেছু পেছু এসেছে মজা দেখতে। কাজে কোনো রকমে ফাঁকি দিতে পারলে হয়।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর বাড়িখানা ভালো করে দেখলুম। বেশ বড় পাথরের বাড়ি অনেকটা গির্জা-ধরনের। মাটি থেকে প্রায় আড়াই তলা উঁচু পাথরের গাঁথনি ক'রে সেখানে ঘর বানানো হয়েছে। ঘরের চারিদিকে দরজার মতো বড় বড় জানালা। মেটাজী ও সর্দার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

বলা বাহুল্য, আমরাও তাঁদের পশ্চাদনুসরণ করলুম।

ওপরে গিয়ে দেখলুম প্রকাণ্ড একখানি ঘর—যেমন লম্বা তেমনি চওড়া—ঠিক গির্জাঘরের মতন। ঘরের মেঝে ও দেওয়াল কাঠের। দেওয়ালে চমৎকার ওয়াল-পেপার মারা। ঘরখানাকে মাঝে পার্টিশান দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। ঘরের পাশেই আলাদা ভিতরে ওপরে তৈরী ছোট্ট একখানি ঘর। বেশ বুঝতে পারা গেল, এক সময়ে এই ঘরে কমোড ইত্যাদি থাকত।

মেটাজী বললেন—এই ঘরে সায়েবদের পায়খানা ছিল, তোমরা এইখানেই রান্নাবান্না কোরো।

মেটাজী আরো বললেন—আজ থেকেই কাজে লেগে যাও—একটা দিনের 'রোজ' কেন আর মারা যায়।

সেই বিরাট ঘরের এক কোণে আমাদের ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলি-গুলো রেখে তখুনি তৈরি হয়ে নিলুম। মেটাজী ব'লে দিলেন—দেখ, ভোর ছ'টোর সময় কাজে লাগতে হবে। বেলা এগারোটায় ছুটি পাবে। ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে খেয়ে-দেয়ে আবার বেলা একটার সময় গিয়ে কাজে লাগবে আর ছুটি পাবে বিকেল ছ'টায়। দুপুরে, ছুটির সময় জল-টল তুলে রাখবে। কারণ বিকেলে ঘরে এসেই সিঁড়ির দরজা ভালো করে বন্ধ করে দেবে। তার পরে আর নিচে নামা চলবে না।

জিজ্ঞাসা করলুম—কেন মশায় ?

তিনি বললেন—এ জায়গাতে আবার সন্ধ্যের পর জানোয়ার বেরোয় বলে শুনেছি।

কি জানোয়ার বেরোয় সে-কথা জিজ্ঞাসা করায় মেটাজী ধমকে উঠে বললেন—সে কথায় তোমাদের দরকার কি ? বারণ করলুম, দরজা খুলে রেখো না। বাস্।

কথায় কথায় মেটাজী বললেন—মনে কোরো না যে, তোমরা এসে এখানে থাকবে ব'লে শেঠজী তোমাদের জন্য এই বাড়ি তৈরী ক'রে রেখেছেন।

মেটাজীর মুখে অনেকক্ষণ থেকে এইসব ক্যাটে কেটে কথা শুনতে শুনতে আমার ধৈর্যচ্যুতি হল। বলে ফেললুম—তা যে হয়নি তা আমরা জানি। ভাগ্যদোষে আজ আমাদের এই অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে ব'লে মেটাজী মনে করবেন না, আপনার চাইতে আমাদের বুদ্ধি কম আছে।

আমার জবাব শুনে মেটাজীর মেজাজ একেবারে জল হয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন—না, না রাগ করছ কেন ? আমি ঠাট্টা করেছি।

মেটাজী বলতে লাগলেন—এইখানে তিনজন ক্রীশ্চান পাদরী থাকতেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম বা আমেরিকা—এই রকম কোনো একটা জায়গায় ছিল তাঁদের বাড়ি। ঠিক কোন্ জায়গায় তাঁদের বাড়ি তা তিনি জানেন না, তবে তাঁরা ছিলেন একেবারে গোরা।

জিজ্ঞাসা করলুম—তাঁরা এখানে কী করতেন ?

তাঁরা এসেছিলেন এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে আলোক বিকিরণ করতে। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতে পালাতে পথ পেলেন না—ব'লেই মেটাজী উচ্চহাস্য করলেন।

কিন্তু মেটাজীর কথাটা শুনে আমরা বিশেষ উৎসাহ বোধ করলুম না। জানোয়ারের কথা শুনে মনটা আগেই দমে ছিল—তার ওপর

ক্রীশ্চান পাদরীদের পলায়নের কথা শুনে আরও দমে গেলুম। ভাবলুম ক্রীশ্চান পাদরী—যাঁরা আফ্রিকার সিংহসঙ্কুল গভীর অরণ্যে নরখাদক অর্ধমনুষ্যদের মধ্যে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে ভয় পান না, তাঁরা কিসেব ভয়ে এখান থেকে পালিয়ে গেলেন! আব আমরাই বা এমন কি তালেবর লোক যে, সে-স্থানে আমাদের নিয়ে এসে রাখা হচ্ছে।

ব্যাপার বিশেষ সুবিধের নয় মনে ক'রে মেটাজীকে জিজ্ঞাসাই ক'রে ফেলা গেল—হ্যাঁ মশাই, ক্রীশ্চান পাদরীরা এখান থেকে ভেগে গেলেন কিসের ভয়ে?

মেটাজী সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন—যেতে দাও, অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে—এবাব কাজে চল।

মেটাজী ও সর্দারের পেছনে পেছনে চলতে লাগলুম। এক জায়গায় এসে তাঁরা দাঁড়াতেই আমরাও দাঁড়ালুম। সেখানে দেখলুম পথের দু'ধারে বড় বড় মানুষ-সমান ঘাস হয়ে রয়েছে। সর্দাব বললেন—এই যে বড় বড় ঘাস দেখছ—এর নীচে করোগেটেড আয়রনের মতন জমিতে আলুর ক্ষেত আছে।

মেটাজী আবার ব'লে দিলেন—রাঙা আলুব ক্ষেত—লতানে গাছ চেনো তো? দেখো যেন ঘাস তুলতে আসল গাছ তুলে ফেলো না।

মেটাজী যাবার সময় বললেন—বেশ মন দিয়ে কাজকর্ম করবে। আমি সর্দারকে বলে গেলুম, সে কাল তোমাদের 'রোজ' দেবে, তাই দিয়ে বাজার ক'রে এনো।

মেটাজী বিদায় নিলেন আর আমরা 'জয় দুর্গা' বলে মনের আনন্দে আলুর ক্ষেতে ঘাস তুলতে লেগে গেলুম। আমাদের আশে পাশে যেসব নরনারী মজুরের কাজ করছিল তারা কিছুক্ষণ এই জামা-পরা মজুরদের দিকে অবাক হ'য়ে দেখে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ বোধ হয় আমাদের সম্বন্ধে কথাবার্তা ব'লে আবার যে যার কাজে লেগে গেল।

আমরা যে জায়গাটিতে ঘাস ছিঁড়ছিলুম সেখানে আরও গুটি দুই তিন পুরুষ ও নারী কাজ করছিল। তারা আমাদের অনভ্যস্ত হাতের

কাজ দেখে মাঝে মাঝে কি সব বলাবলি ও হাসাহাসি করতে লাগল। দুনিয়ায় ঘাস-ছেঁড়ারও ভালোমন্দ আছে।

ভালোই হোক আর মন্দই হোক, কোনোরকমে বিকেল ছ'টা অবধি কাজ করবার পর সেদিনকার মতো কাজ শেষ হল। আমরা তো একরকম ছুটতে ছুটতে এসে সেই ভাঙা পাত্রে জল তুলে হাত মুখ ধুয়ে নিজেদেব বাসস্থানে এসে ঢুকলুম।

প্রকাণ্ড দবজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি যে, সেটি বন্ধ করবার অসংখ্য হুড়কো, খিল ও ছিটকিনিব ব্যবস্থা কবা হয়েছে। সেই পুরোনো ও অনেকদিন অব্যবহারে প্রায় অকর্মণ্য হুড়কো প্রভৃতি যথাস্থানে সংযোজন কবতে আমাদেব তিনজনেব প্রায় দম-বন্ধ হবাব অবস্থা। কোনোরকমে সেগুলি লাগিয়ে আমবা পূর্বদিকেব একটি প্রকাণ্ড জানালা খুলে দিয়ে দাঁড়ালুম।

তখনও সূর্য একেবাবে অস্ত যায়নি। অস্তগামী তপনের নিবস্ত আলো এসে পড়েছে গাছের চূড়ায়। আমাদেব সম্মুখে দক্ষিণে বামে যতদূব দৃষ্টি যায় সুদূর প্রসারী বনশ্রেণী। গাছের পর গাছ উঁচু নিচু সরু মোটা—সবলে ধরিত্রী মাতাকে আকড়ে ধবে দাঁড়িয়ে আছে। দূব দূব—আবো দূবে পাহাড়ের সাবি স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হতে হতে মেঘলোকে মিলিয়ে সত্য ও কল্পনায় জড়াজড়ি হয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে শত-লক্ষ বিহঙ্গমের কাকলীতে মর্ত্য ও অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ। আমাদের চোখে সেই দৃশ্য ফুটে উঠছে—কানেব মধ্যে সেই বিরাট শব্দ এসে পৌছেছে বটে, কিন্তু মন শূন্য—চিত্তে এসবের প্রতিক্রিয়া কিছুই হচ্ছে না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ অনুভব করলুম এখন পাখীদের কলরব থেমে গিয়েছে, বনভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

অবণ্যমাতার কোলে আমাদের প্রথম সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিয়ে সেখান থেকে সরে এলুম। মোমবাতি অনেক দিন আগে থেকেই কেনা ছিল, তাই জ্বালিয়ে নিজের ধুতি পেতে বিছানা করলুম। আমাদের কারো মুখে কোনো কথা নেই

—সকলেরই মন ভারী। মনের কোন্ গহনে বিরাট বেদনা ও অভিযোগ জমা হচ্ছিল। কিসের বেদনা ও কার ওপরে অভিযোগ—তার স্পষ্ট ধারণা নেই। মন যেমন ভারী সেই অনুপাতে উদর তেমনি হালকা। তার ওপরে সারাদিনের সেই পরিশ্রমে দেহ ক্লান্ত। শুয়ে শুয়ে এই তিনের ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লুম

ভোর হতে তখনও অনেক দেরি, কিন্তু পাখীদের বিপুল চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙল বটে, কিন্তু শরীর এত দুর্বল যে, পাশ ফিরতে পারি না। আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে বন্ধুদের ডেকে তুলে মুখ ধুয়ে একটু বসতে না বসতে ভোর হয়ে গেল।

সেদিন বেলা তখন প্রায় দু'টো হবে, আমরা খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে এরকম কাঁপতে কাঁপতে সর্দারের কাছে গিয়ে বললুম—হয় আমাদের কিছু খেতে দিন আর না হয় পয়সা ও ছুটি দিন—বাজারে গিয়ে কিছু খেয়ে আসি।

সর্দার তখন ঘুমোচ্ছিল। আমাদের চেঁচামেচি শুনে সুখশয্যা ছেড়ে এসে খিদের কথা শুনে একবার 'ও' ব'লে ন'গণ্ডা পয়সা একবার দু'বার তিনবার গুণে আমার হাতে দিলে।

পয়সা হাতে নিয়ে একেবারে হক্‌চকিয়ে গেলুম। আঁ! এই ফরেস্ট-ডিপোর্টমেণ্টে কাজ ক'রে দৈনিক মাত্র ছ'পয়সা। এতে সবাই খাবই বা কি? আর পরবোই বা কি?

কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় তখন আর পরবার কথা চিন্তা করবার অবসর নেই। তখুনি সেই লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলুম বাজারের দিকে। পথ চলেছিতো চলেইছি; কিন্তু কোথায় বাজার? সঙ্গের লোককে যত প্রশ্ন করি সে কিছুই জবাব দেয় না। অনেক সাধাসাধি করবার পর হয়তো যদি কিছু বলে। কিন্তু সে-ভাষা কিছুতেই বুঝতে পারি না। শেষকালে প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক পথ চলে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলুম—শোনা গেল, সেটা নাকি বাজার।

বাজার বললে বটে, কিন্তু দোকানপত্র কোথায়? দু'একখানা পাতা

ছাউনি ঘর—তারও দরজা অর্থাৎ ঝাঁপ বন্ধ। একটা এইরকম ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে লোকটা আমাদের বললে—এই একটা দোকান।

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধ'রে চেঁচামেচি করার পর দোকানদার দরজা খুলতে আমাদের গাইড তাকে কি বললে। দেখা গেল, খরিদ্দারের শুভাগমনে লোকটি বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—ভালো চাল আছে?

সে অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। বেশ বোঝা গেল যে 'চাল' শব্দটি তার কর্ণকুহরে ইতিপূর্বে প্রবেশ করেনি। আমরা খাদ্য, অন্ন, তণ্ডুল, ধান্য ইত্যাদি নানা শব্দ দিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ইতিমধ্যে পিলপিল ক'রে চারিদিক থেকে লোক এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াতে আরম্ভ করলো। আমাদের কথা শুনে তারাও নিজেদের বিদ্যে অনুসারে দোকানদারকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সে কিছুতেই বুঝতে পারলে না। শেষকালে চলে যাচ্ছি দেখে সে ঘরের ভেতর থেকে একটা পুঁটলি নিয়ে এসে সেটা আমাদের খুলে দেখাল। দেখলুম তার মধ্যে ধুলোর মতন কালো খানিকটা কী জিনিস পড়ে রয়েছে, তাতে আবার পোকা ধরেছে।

সেটি কী দ্রব্য জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার ও আমাদের চারপাশের যত নরনারী দাঁড়িয়ে ছিল সবাই মিলে চিৎকার ক'রে সে দ্রব্যটির গুণাগুণ বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক ধস্তাধস্তির পর বোঝা গেল যে, সে বস্তুটি বাজরার আটা—খুবই রুচিকর ও পুষ্টিকর খাদ্য। চাল যখন পাওয়া গেল না তখন আপাতত বাজরার আটাই দিতে বললুম এক সের। দোকানদার আবার বাড়ির ভেতর থেকে এক টুকরো পাথর নিয়ে এসে বাটখারার বদলে তাই দিয়ে সেই ধুলোরূপী পুষ্টিকর ও রুচিকর গুঁড়ো ওজন ক'রে দিলে। সেখান থেকে এক পয়সার নুন কিনে বেরোলুম অন্য দোকানের সন্ধানে। পেছনের সেই ভীড়ও চলল আমাদের সঙ্গে।

অনেক বলা কওয়া ও জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা এক কুমোর-বাড়িতে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলে। দেখলুম সেখানে নানারকম মাটির তৈরী জিনিস রয়েছে, কিন্তু হাঁড়ি নেই। অনেক চেষ্টা ক'রেও হাঁড়ি কী দ্রব্য তা বোঝাতে না পেরে শেষকালে আধা-কলসী ও আধা-হাঁড়ি গোছের একটা জিনিস কিনে প্রায় ছুটতে ছুটতে স্টেশনে এসে মুড়ি ছোলা ভাজা ইত্যাদি যা পাওয়া গেল একরকম পেট ভরে খেয়ে নিয়ে দৌড়লুম, ডেরার দিকে।

জঙ্গলে গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যে হয়ে এলেও একটু আলো ছিল। ওরি মধ্যে একরাশ শুকনো কাঠি যোগাড় ক'রে, নতুন পাত্রে জল ভরে, ঘরে উঠে দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম। বাড়ি থেকে ফিরে আসবার মুখে সন্ধ্যার আবহাওয়ায় কালীচরণ একটা চিচিঙ্গে ছিঁড়ে এনেছিল। সে বললে—এই রুটি খাওয়ার অভ্যেস তো কখনো নেই, এই চিচিঙ্গের কালিয়া দিয়ে রুটি মারা যাবে।

প্রায় তিনদিন একরকম নির্জলা উপবাসের পর এই মহাভোজের আয়োজন দেখে মনটা খুশীই হয়ে উঠল। যাই হোক, তিনজনে মহা উৎসাহে আমাদের রান্নাঘর অর্থাৎ পাদরীদের ভূতপূর্ব পায়খানা ঘরে তো ঢোকা গেল। তখনো ঘরের মেঝেতে দুটো তিনটে কমোডের দাগ ঝকমক করছিল, কিন্তু জীবনে উন্নতি করতে গেলে ওসব ছোট খাটো দাগকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে চলবে না।

আধখানা চিচিঙ্গে ছুরি দিয়ে কুচিয়ে মনে হল রান্না হবে কিসে? পাত্র কোথায়? রাঁধবার একটা পাত্র কিনে আনা হয়নি বলে আপশোস হতে লাগল। শেষকালে সর্দারের দেয়া হাঁড়ির অংশ—যা এই দুদিন আমাদের জলপাত্রের অভাব দূর করেছে, তাইতে জল দিয়ে আগুনে চাপিয়ে দেওয়া গেল। জল একটু সোঁ সোঁ করতেই কুঁচোনো চিচিঙ্গে তাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা আটা মাখবার বন্দোবস্ত করতে লাগলুম।

মাটিতে কোঁচার খুঁট পেতে তাতে সেই ধুলোরূপী বাজরার গুঁড়ো

ঢেলে একটু একটু করে জল দিয়ে মাখবার চেষ্টা করতে লাগলুম। মধ্যে মধ্যে কাঠি দিয়ে এক আধ টুকরো তবকারি নামিয়ে দেখা হচ্ছে সিদ্ধ হয়েছে কিনা।

এমন সময় টাই করে এক বিরাট আওয়াজে চমকে উঠলুম। পরমুহূর্তেই অর্থাৎ চমক ভাঙবাব আগেই একটি বজ্রনির্ঘোষ এবং তারপবেই অগ্নিবৃষ্টি—মুহূর্তের মধ্যে আমাদেব মুখ হাত পিঠ গরম চিচিঙ্গে-চূর্ণ চড়চড়িয়ে উঠল।

—বাপরে—বলে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে চিচিঙ্গেব টুকবো-গুলো গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলুম। তারপর ঘবের মধ্যে ঢুকে দেখি—মেঝেতে তবকাবির টুকরোগুলো প'ড়ে বয়েছে। সেই ভাঙা হাঁড়ির কানা আবর্জনা বহন ক'রে যার শেষজীবন কাটছিল—অতিরিক্ত চাপ সহ্য কবতে না পেরে সে দেহরক্ষা কবেছে। ভাবতে লাগলুম—হাঁড়িভাঙা তো দেহরক্ষা কবলে কিন্তু আমাদের এখন দেহবক্ষাব উপায় কি! তখন সেই নিবন্ত আগুনে ময়দার ঢেলাগুলো পুড়িয়ে নিয়ে আর আধখানা চিচিঙ্গে যে ছিল তাই দিয়ে দু'দিন নিরম্বু উপবাসেব পর পরমানন্দে পারণে প্রবৃত্ত হলুম।

যাই হোক, সে রাত্রে রান্না করার চেষ্টা ক'রে আমরা বুঝতে পারলুম যে নিজে রান্না ক'বে খেয়ে এখানে কাজ করা চলবে না। সকালবেলা সর্দার আমাদেব কাজের তদন্ত করতে এলে তাকে কাল রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কবে বললুম।

সেদিন বেলা চারটের সময় সর্দারের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ইষ্টিশনে গিয়ে সেই তল্লাটে খুঁজে খুঁজে রুটি-গোস্ত-এর দোকানে বসে আহার কবা গেল। তিনজনে মিলে সেখানে দু-আনার খেয়ে পরদিন দুপুরবেলার খাবার জন্য এক আনার রুটি কিনে নিয়ে ফিরে এলুম। আমাদের থাকবার জায়গায় এসে তখনো অনেকখানি বেলা রয়েছে দেখে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দেখে বেড়াতে লাগলুম।

সেখানকার একটা দৃশ্য আজও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

এক জায়গায় দেখা গেল একটা বিরাট গাছকে বেড়ে একটা লতা ওপরে উঠে নিজের ডালপালা দিয়ে গাছটার ডালপালাকে একেবারে ঢেকে দিয়েছে, আর, সেই লতায় ফুটেছে ছোট ছোট সাদা ফুল। এত ফুল যে, গাছ আর লতা সে ফুলে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ওপর থেকে সেই ফুল ঝরে-ঝরে গাছটাব চাবিদিকের মাটিতে যেন ফুলের বিছানা পাতা হয়েছে, আর সেই ফুলের সৌবভে বন আকুল হয়ে উঠেছে, আমরা কাছে যাওয়ামাত্র মৌমাছিব দল ভোঁ-ও-ও ক'বে আপত্তি জানাতেই পেছু ফিরে পালিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর সেই ফুল-সৌরভে মন-প্রাণ দেহ ভরে নিয়ে নেশায় টলতে টলতে ডেরায় ফিবে এলুম।

ফুলের গন্ধে নেশা লেগেই হোক কিংবা কয়েকদিন অনশন ও অর্ধাশনের পরে শত শরতের পুরাতন বলদের মাংস পেটে পড়েই হোক ঘরে এসে দোর-জানালা দিয়ে বসতে না বসতেই আমাদের কালীচরণের কিরকম ভাবদশা লেগে গেল। সে শুরু ক'রে দিলে কি ছাব আর কেন মায়া কাঞ্চন কায়া তো রবে না।

অনেক রাত্রি অর্থাৎ সন্ধ্যে থেকে প্রায় দু'ঘণ্টা গল্প ক'বে আমরা শুয়ে পড়লুম।

ঘুমেব মধ্যে বিরাট একটা শব্দ কানে যেতে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। আচমকা ওইরকম আওয়াজে আমি যেন জ্ঞানহাবা হয়ে গেলুম। আমার পাশেই যে বন্ধুরা শুয়ে আছে সে-কথা স্রেফ ভুলে গিয়ে ভয়ে দিলুম দৌড়, কিন্তু আছড়ে পড়ে মাথা ও মুখে বিষম আঘাত লেগে সম্বিৎ ফিরে পেলুম; ততক্ষণে কালী ও পরিতোষ উঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে ফেললে।

সেই স্বল্পালোকেই দেখতে পেলুম ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে আর হাত কাঁপছে একটু একটু করে। আওয়াজ তখনো সমানভাবে চলছে। মনে হতে লাগল হাজার হাজার রাজহাঁস যেন একটা গলা দিয়ে চিৎকার করে চলেছে। পরিতোষ ও কালী আমাকে সেই রকম

দেওয়ালের কাছে দেখে মনে করেছিল আমার সঙ্গে সেই আওয়াজের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু যখন তাদের বুঝিয়ে দিলুম যে আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে ঘুমের ঘোরে আমি ওই রকম ভাবে ছুটে গিয়েছিলুম তখন তারা কথঞ্চিৎ শান্ত হল।

কিন্তু শান্ত হবার জো কি! ওদের আওয়াজের প্রচণ্ডতা ক্রমেই বাড়তে লাগল। ঘরের পূর্বদিকে চারটে দরজায় বড় বড় সমান আকারের জানালা ছিল। মনে হতে লাগল যেন পালা করে এক-একবার এক-একটা জানালার কাছে আওয়াজ হচ্ছে আর তারই ধমকে জানালাগুলো থর থর করে কাঁপছে।

আমরা আস্তে আস্তে ভূমিশয্যা ত্যাগ করে পা টিপে টিপে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কেন যে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম তা ঠিক জানি না। দরজার কাছে যেতেই জানলার দিকের আওয়াজ কমে গেল। বেশ মনে হতে লাগল আওয়াজটা যেন দূরে সরে যাচ্ছে। একটুখানি প্রাণে ভরসাও এল। কিন্তু তখুনি আমাদের ভ্রম ছুটে গেল। বুঝতে পারলুম যে আওয়াজটা জানলা ছেড়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরিতোষ অনেক গবেষণা করে বললে—এ মনে হচ্ছে হাঁসভূত। অতি দুঃখেও হাসি পেল। হংস দূতের কথা শোনা আছে কিন্তু হংসভূতের কথা'তো কখনো শুনিনি বাবা। ওদিকে হংসভূতের গর্জনের ঠেলায় মনে হতে লাগল ঘরের মধ্যে যমদূত এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভয়ে আমাদের দেহে কালঘাম ছুটতে আরম্ভ করলে। সন্ধ্যাবেলায় রুটি গোস্ত ও কালরাত্রের কাঁচা চিচিঙ্গে ও কাঁচা ময়দার ঠুলি ভুল হয়ে দেহ বেয়ে ঝরতে লাগল। কতক্ষণ ধরে এই দুর্ভোগ আমাদের ভোগ করতে হয়েছিল অধিক বলতে পারি না। আমাদের তো মনে হয়েছিল—এই গর্জন শুনতে শুনতেই জীবন অবসান হবে।

হংসভূতের গর্জন থেমে যাওয়ার পর বুকের ধড়ফড়ানি থামতে থামতে ভোর হয়ে গেল।

সকালবেলা কাজে লাগবার খানিক পরে সর্দার যখন রোঁদে এল

তখন তাকে কাল রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বললুম। সর্দারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি এমন সময় দেখলুম আমাদেব চারপাশে অনেকগুলি এসে দাঁড়িয়েছে। দেখলুম, আমাদের কথা শুনে তাদের মধ্যে জন্তুর মতো চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে। আস্তে কথা বলার রীতি তাদের মধ্যে নেই—তারা নিজেদের ভাষায় সশব্দে কিসব আলোচনা আরম্ভ করে দিলে। সর্দার একটা বিরাট ধমক ও তাড়া দেওয়ায় তারা যে যার কাজের দিকে চলে গেল। সর্দার আমাদের একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে এসব কথা তোমরা ওদের বলেছ নাকি ?

—না তো !

সর্দার বললে—খবরদার ! ওদের কিছু বোলো না, তা হলে ওরা সব কাজে আসা বন্ধ করে দেবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—ওটা কি জানোয়ার ? সর্দার তার হাঁড়ি মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বললে—ও জানোয়ার না, ও হচ্ছে দেও। জঙ্গলে কতরকমের জিনিস আছে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

মনে মনে বললুম—একরকম জিনিসেই যা অবস্থা হয়েছে –

সর্দার বললে—তোমরা কিছুতেই দরজা কিংবা জানালা খুলো না —তাহলে বিপদে পড়বে বলে দিচ্ছি।

সর্দার রোঁদ দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতেই চারিদিকে মজুরের দল—যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এসে আমাদের নানারকম প্রশ্ন করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। এ কয়েক দিন তাদের কথা শুনে শুনে সে ভাষা বলতে না পারলেও কিছু কিছু বুঝতে আরম্ভ করেছিলুম। আমাদের রাত্রের —অভিজ্ঞতা শুনে তারা যা বললে—তার তাৎপর্য হচ্ছে – এ জঙ্গলে অনেকদিন থেকেই দেবতারা বাস করছেন। এ জায়গাটা পরিষ্কার করার ফলে তাঁরা এখন সদলে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেছেন। মাঝে মাঝে ওই বাড়িটাতে এসে কেউ হানা দিয়ে থাকেন। ওইখানে সায়েবরা থাকত। দেবতারা এসে চলে যেতে বলায় তারা বাড়ি ফেলে চলে গিয়েছে।

আমরা তখন একটা লাঙল-চষা জমিতে পাথর ও আগাছা বাছবার কাজে লিপ্ত ছিলুম। আমার কাছেই একটা অল্পবয়সী মেয়ে কাজ করছিল। তার বয়স বোধ হয় পনের যোল বছর হবে। অত্যন্ত রোগা, কিন্তু বসন্তের বাতাস পেলে যেমন কোনো কোনো শুকনো কাঁটা গাছেও ফুল ধরে, তেমনি তার দেহে যৌবনের আগমনীর সামান্য সুরের আমেজ লেগেছে মাত্র। কাজ করতে করতে একবার দু'জনে খুব কাছাকাছি এসে পড়ায় সে আমাকে কি যেন বললে। তার কথা ভালো করে বুঝতে না পারায় আমি আরও কাছে সরে যাওয়ায় সে আবার বললে—কাল রাতে কি হয়েছিল তোমাদের ?

বললুম—তুমি কি করে জানলে ?

সে বললে—সবাই বলছে কাল রাতে তোমাদের ঘরে নাকি দেও এসেছিল।

বললুম—দেও কিনা জানি না, তবে—এসেছিল কেউ।

মেয়েটিকে কাল রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেই সে দাঁড়িয়ে উঠে তার মাকে ডাকলে। মা দূরে আমাদের ক্ষেত্রেই কাজ করছিল। মেয়ের ডাক শুনে একরকম ছুটে কাছে এল। মায়ের দেখাদেখি বাপ, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে যারা সকলেই কাছাকাছি কাজ করছিল—ছুটে এগিয়ে এল। মেয়েটি সকলকে কি সব বলায় মা এগিয়ে এসে আমাদের বললে—ও বাড়িতে আর তোমরা থেকো না। দেও বড় সর্বনেশে জিনিস !

আমরা বললুম—কিন্তু সর্দার—ব'লে দিয়েছে ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে আর কোনো ভয় নেই—আমরা

সহচর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্গী ভদ্রলোক হঠাৎ আবিস্কার করলেন সামনের একখানা ছয়-বার্থের সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ করেছেন তাঁরই পরিচিত একদল এবং তাদের বার্থ খালি যাচ্ছে একখানা। খবরটা সংগ্রহ হতে না হতে হৈ হৈ করে তিনি মালপত্র টেনে নামালেন। যাওয়ার সময় এক গাল হেসে বলে গেলেন, "ভালোই হল মশাই আপনার। এখন আপনি একচ্ছত্র। বেশ সম্রাটের মতো ঘুমিয়ে যেতে পারবেন।"

'সম্রাট' 'একচ্ছত্র'—এ-সব ভালো কথা শোনবার আগেই আমি অনুমান করেছিলুম, বাইরের কার্ডে যাঁর নাম ছিল, তিনি এ কালের একজন দিক্‌পাল্ সাহিত্যিক! আমি তাঁকে অবশ্য কখনও দেখিনি, কিন্তু তাঁর ছবির সঙ্গে এ ভদ্রলোকের চেহারারও সাদৃশ্য ছিল যথেষ্ট। তাই একখানা 'কুপে'তে ওপরের বার্থে এমন একজন ভয়ঙ্কর বিখ্যাত সঙ্গীকে নিয়ে ট্রেন যাত্রার কল্পনায় রীতিমতো শঙ্কিত ছিলুম আমি।

সাহিত্য এবং সাহিত্যিক—দুটোকেই আমি নিদারুণ ভয় করি। আমি কাজ করি স্ট্যাটিসটিক্‌সে এবং এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই সংখ্যাতত্ত্বের কাছে রসতত্ত্বের স্বাদ অত্যন্ত জোলো বলে মনে হয় আমার কাছে। সারা ভারতবর্ষে বছরে কোন্ ভাষার কত বই ছাপা হয় তার হিসেব মোটামুটি একটা দিতে পারি, কিন্তু উর্ধ্বলোকবিহারী সাহিত্যিক মহারথটি যদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন তাঁর কী কী বই আমি পড়েছি—তা'হলেই গেছি। মানসাঙ্কে ফেল করা ছাত্রের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া নাস্ত্যেব গতিরন্যথাঃ।

কাজেই তিনি নেমে যেতে বেশ খানিকটা স্বস্তিই অনুভব করলুম।

—সন্দেহ কী! বেশ নিজের মতো বিছানা পেতে নিলুম—গুছিয়ে নিলুম জিনিষপত্র। তারপর আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে মুখাগ্নি করলুম সিগারেটে।

হাওড়া থেকে যখন ট্রেনটা ছাড়ল—সেই স্বস্তির আমেজে তখনও ভরপুর হয়ে আছি। পর পর উল্কাবেগে যখন কয়েকটা স্টেশন ছিটকে বেরিয়ে গেল, তখনও। কিন্তু আলো নিভিয়ে শোওয়ার উপক্রম করতেই কি রকম একটা অদ্ভুত অশান্তি আমাকে পেয়ে বসল।

হঠাৎ মনে হতে লাগল, আমি একা। শুধু এই ছোট কামরাটুকুর ভেতরেই নয়—এই বিরাট ট্রেনটাতে আমি একা ছাড়া আর কোথাও কোন যাত্রীই নেই। একটা অতিকায় ভূতুড়ে গাড়ী আমাকে নিয়ে একরাশ অজানা অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কোথায় যাচ্ছে আমি জানি না, হয়তো গাড়ীটারও সে-কথা জানা নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি উঠে বসলুম আলো জ্বেলে দিলুম। আর তীক্ষ্ণ তীব্র আলোর একটা ঝাপটা চোখে এসে লাগবার সঙ্গে-সঙ্গেই অস্বস্তির ঘোরটা কেটে গেল। সত্যি কথা বলতে গেলে হাসিই পেল আমার। সাহিত্যিকের সঙ্গগুণ আছে বটে। ভদ্রলোক আমার সহযাত্রী না হতেই তাঁর ব্যাধি এসে আমাকে ছুঁয়েছে—সঙ্গে থাকলে আর রক্ষা ছিল না দেখা যাচ্ছে। কী করে যে এসব উদ্ভট কল্পনা মাথায় এল – আশ্চর্য্য!

একগ্লাস জল খেয়ে, একটা আলো জ্বেলে রেখে শুয়ে পড়লুম আবার।

কিন্তু চোখের কাছে আলো জ্বললে আমার কিছুতেই ঘুম আসে না। বিরক্ত হয়ে আমি এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। অথচ আলো নিবিয়ে দিতেও সাহস হচ্ছে না—পাছে আবার ওই সমস্ত এলোমেলো ভূতুড়ে ভাবনা আমাকে পেয়ে বসে। চোখের পাতা দুটোকে যথাসাধ্য চেপে ধরে প্রাণপণ ঘুমের সাধনা শুরু করলুম।

সেও মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে। তার পরেই একটা নতুন ভাবনা আমাকে পেয়ে বসল। বড় বেশী জোরে যাচ্ছে নাকি গাড়ীটা—বড় বেশী অস্বাভাবিক স্পীডে? যতগুলো রেলওয়ে অ্যাক্সিডেণ্টের খবর জানি একটার পর একটা মনে পড়ে যেতে লাগল সেসব। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে অন্ধের মতো ছুটছে ট্রেনটা—পার হয়ে যাচ্ছে ঘুমন্ত গ্রাম, শূন্য প্রান্তর, কালো জঙ্গল, নদীর পুল। এই নির্জন নিশীথ যাত্রা যেন ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কে বলতে পারে কোথায় আলগা হয়ে আছে একটা ফিস প্লেট, কোথায় ব্রীজের পিলারে ধরছে ফাটল। মুহূর্তের ভেতরে লাইন থেকে ছিট্‌কে পড়ে যেতে পারে ট্রেনটা, তারপর—

আবার আমি নিজের ওপরে বিরক্ত হয়ে উঠলুম। কি আশ্চর্য—কেন এ সমস্ত অবান্তর অর্থহীন ভাবনা আমার! প্রতিদিন, প্রতিরাত এমনি অসংখ্য ট্রেন সারা ভারতবর্ষময় ছুটে বেড়াচ্ছে, তাদের ক'খানাতে অ্যাক্সিডেণ্ট হয়? দুর্ঘটনা ঘটার ভয় আমার যত বেশী। তার চাইতেও অনেক বেশী রেল কোম্পানীর—এই গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের। কম করেও তিনচারশো মানুষের প্রাণের দায়িত্ব যাদের হাতে, এ সব ভাবনা আমার চাইতে ঢের বেশীই ভাবছে তারা।

আমি আবার উঠে পড়লুম। 'টয়লেটে' ঢুকে মাথায় চোখে ঠাণ্ডা জল দিলুম খানিকটা। একা গাড়িতে এভাবে চলবার অভিজ্ঞতা জীবনে আমার প্রথম নয়—যার জন্যে এই সমস্ত ছেলেমানুষী দুশ্চিন্তা আমাকে পেয়ে বসবে! কোনো কারণে মাথা গরম হয়ে গেছে, তাই এই কাণ্ড!

দুটো পাখারই রেগুলেটার পুরো ঠেলে দিয়ে গাড়ি অন্ধকার করে আবার শুয়ে পড়লুম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই অদ্ভুত ভয়টা যেন বুকের ওপরে এসে চেপে বসতে লাগল। মনে হতে লাগল, কোথায় কী যেন ঘটতে চলেছে—কী একটা নিশ্চয় ঘটবে! আজ হোক কাল

হোক—এই গাড়িতে হোক আর পরে হোক। আরো মনে হতে লাগল, এই গাড়িতে এখন আর আমি একা নেই, আমার সঙ্গে আর কেউ—অথবা আর কিছু একটা চলেছে। আমার এই বার্থটার নীচেই সে গুঁড়ি মেরে বসে আছে। একবার মাথা নামিয়ে নীচের দিকে তাকাতেই আরো দুটো জ্বলজ্বলে চোখ আমি দেখতে পাবো।

কিন্তু এইবারে আমি নিজের ওপরে চটে উঠলুম। পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি আমি! কোন কারণ নেই—কোন অর্থ নেই, তবু পৃথিবীর যত অবাস্তব উদ্ভট কল্পনা আমাকে পেয়ে বসেছে। হালে কতকগুলি বিলিতী ভূতের গল্প পড়েছিলুম, হয়তো তারই প্রতিক্রিয়া এ সব।

এই অদ্ভুত অস্বস্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে এবার আমি মনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলুম দস্তুরমতো। প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করলুম সংখ্যাতত্ত্বের কতকগুলি জটিল সমস্যা—যা ভেড়া গোণবার চাইতেও কার্যকরী। তারপর প্রায় আরো এক ঘণ্টা পরে—গাড়ি খড়্গপুর ছাড়িয়ে গেলে, আমার চোখে ঘুম নেমে এল।

কিন্তু কে জানত—জেগে থাকার চাইতেও আরও বীভৎস হয়ে উঠবে ঘুমটা! মনের সমস্ত সরীসৃপ ভাবনা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে ঘুমের ভেতরে! আমি স্বপ্ন দেখতে লাগলুম।

অদ্ভুত কুৎসিত সে স্বপ্ন! পরিষ্কার দেখলুম একটা ন্যাড়া নগ্ন পাহাড় আমার সামনে। তার কোথাও একটা গাছপালা নেই—এক গুচ্ছ ঘাস পর্যন্তও নয়। কলকাতার চিড়িয়াখানার অতিকায় কচ্ছপ-গুলোর মতো বড়ো বড়ো পাথরে ছেয়ে আছে তার সর্বাঙ্গ। চারিদিকে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। শুধু পাহাড়টার মাথার ওপর পড়ন্ত বেলার খানিক রক্ত-রৌদ্র কারো নিষ্ঠুর ভ্রূকুটির মতো জ্বলছে। আর সেখানে – সেই অশুভ রাঙা আলোয় ডানা মুড়ে বসে আছে একটি মাত্র শকুন, যেন অপেক্ষা করে আছে কালপুরুষের মতো।

কিন্তু ওইখানেই শেষ নয়। আরো ছিল তারপর। আমি

দেখলুম, সেই পড়ন্ত আলোয়, সেই ভয়ঙ্কর নগ্নতার ভেতরে—শকুনের সেই ক্ষুধার্ত চোখেব নীচে চারজন মানুষ একটা মৃতদেহ কাঁধে করে নিয়ে চলেছে। কোথায় চলেছে জানি না—তাদের চারজনের চোখে মুখেই একটা বিবর্ণ ক্লান্তি। আব—আর সেই শববাহকদের মধ্যে আমি একজন '

চিৎকার কবে আমি জেগে উঠলুম। আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে তখন দরদর করে ঘাম পড়ছে। চলন্ত ট্রেনেব শব্দ ছাপিয়ে বেজে উঠছে আমার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ।

আলো জ্বেলে দিয়ে উঠে বসলুম এবার! না—আর ঘুমোব না। যে কোনো কারণেই হোক—আমার মধ্যে কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম—রাত প্রায় তিনটেব কাছাকাছি। ঐ সময়টুকু না হয় আলো জ্বেলে বসেই থাকব।

এতক্ষণে আমার মনে অনুতাপ হতে লাগল। সাহিত্যিক ভদ্র-লোককে ধরেই রাখা উচিত ছিল আমার গাড়িতে।

এই দুঃস্বপ্নের চাইতে সাহিত্যচর্চাও নেহাৎ মন্দ ছিল না।

হেলান দিয়ে বসে বসে আবার সংখ্যাতত্ত্ব ভাবতে শুরু করলুম। কিন্তু এতক্ষণে সত্যিই ঘুম আমাকে পেয়ে বসেছে। বসে থাকতে থাকতে আবার আমার চোখ জড়িয়ে এল।

এবং—

এবং একটু পরেই সেই কুৎসিত স্বপ্নটার পুনরাবৃত্তি! সেই পাহাড় —সেই পড়ন্ত বোদ—সেই শকুন! আর তেমনি একটা মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে আমরা চারজন শবযাত্রী!

এবার চীৎকার নয়—আর্তনাদ করে সোজা হয়ে বসলুম আমি। আর পাশের জানলার ভিতর দিয়ে যদি ভোরের ফিকে আভাস দেখা না যেত—তা হলে হয়তো চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে দিতুম, নয় তো ঝাঁপিয়ে পড়তুম দরজা দিয়ে!

উঠে সমস্ত জানালাগুলো খুলে দিলুম। সূর্য ওঠে নি এখনো—বাইরের গাছপালা, মাঠ আর পাহাড়ের ওপরে শুভ্র ধূসর ব্রহ্মমুহূর্ত। একরাশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে কাঁপুনি ধরিয়ে দিলে শরীরে—আমি গ্রাহ্য করলুম না। বিদেশী কবির ভাষায় শুধু আমার প্রাণভরে বলতে ইচ্ছে করছে: "Hail Holy light—"

বেলা আটটার সময় পৌঁছলুম গন্তব্য স্টেশনে। ভূতুড়ে গাড়িটা থেকে নেমে যেন মুক্তিস্নান হল!

স্টেশনে একা ছিল—মামাই পাঠিয়েছেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই আট মাইল রাস্তা পার হয়ে গেলুম।

মামা ব্যাচেলার মানুষ। একটু পাগলাটে ধরনের। প্রথম জীবনে সন্ন্যাসী হয়ে কয়েক বছর অজ্ঞাতবাস করেছিলেন, তারপর এখানে এসে ডাক্তারী শুরু করেছেন। একেবারে পাণ্ডববর্জিত গ্রাম-অঞ্চল। কয়েক বাক্‌স হোমিওপ্যাথি ওষুধের জোরেই এখানে ধন্বন্তরি হয়ে বসেছেন তিনি।

পাহাড়, শালবন, একটি ছোট নদী আর কয়েক ঘর দেহাতী মানুষের ভেতরে মামার লাল টালির ছোট্ট বাড়িটি অত্যন্ত মনোরম। জায়গাটার কাব্যসৌন্দর্য আমি ঠিক বর্ণনা করতে পারব না—সেই সাহিত্যিক ভদ্রলোক থাকলে তিনিই সেটা ভালভাবে করতে পারতেন। মোটের ওপর আমার ধারণা—কলকাতা থেকে যারা কিছুদিনের জন্য পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চায় এবং সেই অজ্ঞাতবাসের সময়ে শহরের কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা না হলেই যারা স্বস্তি বোধ করে এ জায়গা তাদের পক্ষে আদর্শ।

অনেকটা আগ বাড়িয়েই মামা দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর রগের দুপাশে দু গোছা পাকা চুল ঝকঝক করছিল সকালের রোদে।

কিন্তু তার চাইতেও ঝকঝকে হাসি হাসলেন মামা, আর—আয়! পথে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

অসুবিধে ! আমি ম্লান হাসলুম উত্তরে। সারারাত ট্রেনের সেই দুঃস্বপ্নটা আবার আমার নতুন করে মনে পড়ে গেল।

কিন্তু একটু পরেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করে জ্বালা-ধরা চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল, আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল সব, তখন চামচেতে মুরগীর ডিমের পোচ তুলতে তুলতে আমি মামাকে স্বপ্নটা বললুম। শুনে মামা হো হো করে হেসে উঠলেন।

"আসবার আগে মাংস-টাংস খেয়েছিলি বোধ হয় ?"

"তা খেয়েছিলুম। একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল।"

"তাই এই কাণ্ড। পেট গরম হলেই লোকে ওসব খেয়াল দেখে। রান্নার তো দেরি আছে—ব্রেকফাষ্টটা ভালো করে সেরে নিয়ে ঘণ্টা তিনেক নিশ্চিন্তে ঘুমো। আমি ততক্ষণে গ্রাম থেকে একটা রোগী দেখবার পাট সেরে আসি।"

ব্রেকফাষ্ট চুকে যাওয়ার পরে এবং মামার ডাক্তারী ব্যাখ্যাটাকে হৃদয়ঙ্গম করে সমস্ত মনটা বেশ ঝরঝরে হয়ে গেল। তারপর ক্যাম্বিসের খাটিয়ায় গা এলিয়ে দিতেই আবার ঘুমের পালা। এবার নিঃস্বপ্ন এবং নিশ্ছিদ্র।

ঘুম ভাঙল চাকরটার বিকট কান্নায়।

ছুটে বেরিয়ে এলুম বারান্দায়। মামাকে একদল মানুষ বয়ে আনছে কম্পাউণ্ডের মধ্যে। তাদের চোখে মুখে শোক আর বেদনার ছাপ। হাউ হাউ করে কাঁদছে চাকরটা।

"কী হয়েছে ? কী হয়েছে ?" বুকফাটা জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দিলুম আমি।

কিন্তু উত্তরের দরকার ছিল না—আমার মন তা আগেই টের পেয়ে গেছে। তবু কে জানত মামার হার্টের অবস্থা এত খারাপ ছিল ! মাইল চারেক দূরে পাহাড়ী রাস্তায় ওঠবার সময় ঘোড়া থেকে তিনি পড়ে যান। যারা কাছে ছিল, তারা বললে, ঘোড়া থেকে পড়ে তিনি মারা যান নি—পড়বার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কাঁদবার মত শক্তি আমার ছিল না।

এসে যখন পড়েছি, তখন শোকে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা আমার চলে না। আট মাইল দূরের পোষ্ট অফিসে দরকারী টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে—সব ঠিক করে, যখন মড়া নিয়ে বেরলুম—তখন বেলা নেমে এসেছে।

আড়ষ্ট ক্লান্ত পায়ে চলেছি। প্রায় মাইল দেড়েক দূরে শ্মশান।

কিন্তু একি—একি। এখানে নেই ন্যাড়া পাহাড়টা এল কোত্থেকে? কোথা থেকে তার ধারালো চুড়োটার ওপরে অমন করে পড়েছে শেষ বেলার হিংস্র আরক্তিম আলো—কোথা থেকে একটা শকুন এসে সেখানে ডানা মেলে বসেছে কালপুরুষের মতো?

সব এক—সেই স্বপ্নের সঙ্গে সব এক। আমার চারিদিকে সেই অবিশ্বাস্য শূন্যতার সেই প্রেতপাণ্ডুর বিস্তৃতি।

অমানুষিক ভয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম—কে যেন আমার পা দুটোকে টানতে লাগল পাথুরে মাটির তলায়। সারারাত ট্রেনে আমাকে অমন করে ভয় দেখালে কে? আমার বার্থের তলায় গুঁড়ি মেরে যে বসেছিল—কে সে?

সে কি মৃত্যু? আমার সঙ্গে—আমারই সহচর হয়ে এসেছে সে?

●

ভূত নেই

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

আমি তোমাদের আগেও বলেছি এখনও বলছি ভূত আর ভগবান নিয়ে তর্কের আজও শেষ হয়নি। যতদিন মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা থাকবে, ততদিন শেষও হবে না।

এ বিষয়ে পৃথিবীর বিদ্বান এবং সাধারণ লোক দুটো মত পোষণ করেন। কেউ বলেন, বিজ্ঞান ভূতের অস্তিত্ব মানে না, কিন্তু বিজ্ঞানই কি শেষ কথা? আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে? আবার কেউ বলেন ভূত নিশ্চয় আছে।

এমন ঘটনা তোমাদের মধ্যে অনেকেই শুনেছ কিংবা দেখেছ খ্যাতনামা ডাক্তারেরা যে মুমূর্ষু রোগীকে দিনের পর দিন চিকিৎসা করেও সারাতে পারে না, এক সামান্য ফকির রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে কিংবা তার মাথায় একটা রুদ্রাক্ষ ছুঁইয়ে তাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুলেছে।

এতে বোঝা যায় আমাদের লৌকিক জগতের বাইরে আর একটা জগৎ আছে যেটা ঠিক বিজ্ঞানের নিয়মে চলে না!

তোমরা পরজন্ম সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছ। সংবাদপত্রেও নিশ্চয় পড়েছ জাতিস্মর নিয়ে দিন রাত আলোচনা হচ্ছে।

সুদূর রাজস্থানের মরুর মধ্য দিয়ে উটের পিঠে চেপে বাপের সঙ্গে ছোট সাত বছরের ছেলে চলেছে। হঠাৎ একটা গ্রামের কাছে এসে একটা কুটিরের দিকে হাত দেখিয়ে ছেলে বাপকে বলল—

ওই দেখ বাবা ওই আমার বাড়ি। ওখানে আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই আছে।

বাবা প্রথমে কড়া ধমক দিল ছেলেকে, কিন্তু তাকে নিরস্ত করা গেল না, তার মুখে এক কথা।

ওখানে আমার বুড়ো বাপ রয়েছে, বউ চন্দ্রা রয়েছে, ছোট ভাই এক ভোর বেলা পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে আমাকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দেয়। তুমি চলই না ওখানে।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বাপ সেই কুটীরের সামনে গেল, দাওয়ার ওপর এক বৃদ্ধ বসে হাঁপাচ্ছে, একটি বউ জল তুলছে কুয়া থেকে।

ছেলেটি উট থেকে নেমে হনহন করে বৃদ্ধের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বাবা আমি কেশোপ্রসাদ। তোমার বড় ছেলে। দু'চোখের উপর কোঁচকানো মাংসের স্তর নেমেছে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ।

বৃদ্ধ ঝুঁকে পড়ে দেখে বলল।

দিল্লাগি করতে এসেছ? আমার ছেলে আজ আট বছর মারা গেছে ভোর বেলা কুয়া থেকে জল তুলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল কুয়ার মধ্যে।

ছেলেটি বলল—

না, পা পিছলে পড়ে যায় নি, মাধোপ্রসাদ তাকে ঠেলে দিয়েছিল। তার মতলব ছিল আমি না থাকলে বাজরার খেত, বাড়িঘর সবই সে পাবে। যে বউটা জল তুলছিল, সে ছেলেটির কথায় আকৃষ্ট হয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

তার দিকে চোখ পড়তেই ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল।

আরে চন্দ্রা, আমি কেশোপ্রসাদ তোমার মরদ।

চন্দ্রার বয়স বছর ত্রিশের কম নয়। সে সাত বছরের স্বামীকে দেখে হেসে ফেলল, চোখের কোণে একটু জল দেখা গেল।

বলল, পাগল কোথাকার!

ছেলেটির বর্তমান বাপ একটু পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে এগিয়ে এসে বলল, কি ঝামেলা করছিস? দেরি হয়ে হচ্ছে চল।

ছেলেটি যাবার কোন লক্ষণই দেখাল না, দাওয়ার ওপর বসে পড়ে বলতে লাগল।

কোন্ ঘরে সে শুত, সে ঘরে কি আসবাব আছে, বাজরার খেতের পরিমাণ কত, বাপের তুবার সাংঘাতিক অসুখ করেছিল, বিকানীর থেকে সে-ই হেকিম নিয়ে এসেছিল

আরো অনেক কথা সে বলল। সে কোন গাঁয়ে বিয়ে করেছিল। চন্দ্রার বাপের নাম কি। এমন কি বিয়ে করে বউকে নিয়ে যখন ফিরছিল, তখন মরুপথে তুমুল বালির ঝড় উঠেছিল। সে আর চন্দ্রা সারা দেহ আবৃত করে উটের পেটের নীচে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের বাচিয়েছিল।

চন্দ্রা আর চন্দ্রার শ্বশুর তো অবাক্।

সাতবছরের ছেলে এত সব কথা জানল কি করে?

এবার ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল—

মাধোপ্রসাদ তো আর নেই?

না, তাকে খেতের মধ্যে সাপে কামড়েছে। তুই যাবার এক বছরের মধ্যেই।

ছেলেটি যাবার মুখেই বাধা।

চন্দ্রা তাকে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কান্না।

সে তাকে ছেড়ে দেবে না।

ছেলেটি বলল—

আমার নবজন্ম হয়েছে। নতুন আমির ওপর তোমাদের কোন দাবি নেই। আমার বাবা আছে, মা আছে, দাদারা আছে। সে সংসারে আমাকে ফিরে যেতেই হবে। এই নিয়ম। ছেলেটি বাপের সঙ্গে আবার উটের পিঠে চাপল, তবে মাঝে মাঝে সে পুরানো সংসারেও আসত। এই ছেলেটি জাতিস্মর।

আগের জন্মের কথা তার সব মনে আছে।

বিজ্ঞান এর কি ব্যাখ্যা দেবে?

খবর পেয়ে বিখ্যাত এক গবেষক ছেলেটির কাছে গিয়েছিলেন। তাকে নানা পরীক্ষা করেছিলেন। শেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, এর মধ্যে কোন কারচুপি নেই। ছেলেটির সত্যিই আগের জন্মের সব কথা মনে আছে।

এইরকম জাতিস্মরের কাহিনী ইদানীং অনেক শোনা যায়।

শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও।

ঠিক এমনিভাবে ভূতের কাহিনী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।

আজ তোমাদের এমনই এক ভূতের কাহিনী শোনাচ্ছি। এ কাহিনীর সঙ্গে আমি কিছুটা জড়িত। কাজেই এটা যে নির্ভেজাল সত্যি-কাহিনী এ বিষয়ে তোমাদের কাছে আমি হলফ করে বলতে পারি।

আমার একজন খুব নিকট আত্মীয়, নাম আরতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ বি. এল. কিন্তু ওকালতি করে না। বেসরকারি অফিসের আইন-বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার।

থাকত পাইকপাড়ায়। এক বান্ধবীর সঙ্গে একটি ফ্ল্যাট নিয়ে।

বান্ধবীটি এক স্কুলের শিক্ষিকা।

জীবন দুজনের বেশ ভালই কাটছিল। ছুটির দিন সিনেমা, কিংবা আরো অনেক বান্ধবী মিলে বনভোজন, অথবা গড়ের মাঠে প্রদর্শনী দেখতে যাওয়া।

হঠাৎ আরতির বিয়ে ঠিক হলো। পাত্রও উচ্চশিক্ষিত। এক যন্ত্রপাতির কারখানার আধা মালিক।

আরতি আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

আপনি তো অনেক কিছুর সন্ধান রাখেন। আমাকে একটা বাড়ি খুঁজে দিন।

জিজ্ঞাসা করলাম।

কি, কিনবে?

না, না, ভাড়া নেব। খুব বড় দরকার নেই। দুজনের থাকবার

মতন। একটু যেন ভাল এলাকায় হয়, আর দক্ষিণ কলকাতায় দেখবেন, কারণ ওর কারখানাটা কালীঘাটে।

আমি নিজে থাকি বালীগঞ্জে একেবারে লেকের কাছে। পরদিন থেকেই বাড়ি খোঁজা শুরু করে দিলাম। শুধু নিজে নয়, গোটা দুয়েক দালালকেও লাগিয়ে দিলাম।

অনেক বাড়ির সন্ধান এল, কিছু নিজে কিছু আরতিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি দেখতে লাগলাম।

আরতি ভারি খুঁতখুঁতে মেয়ে। কোন বাড়িই তার পছন্দ হলো না। কোন না কোন কারণে সব নাকচ করে দিল।

তিন মাস ঘোরাঘুরির পর কালীঘাট অঞ্চলে এক বাড়ির সন্ধান মিলল।

পার্কের সামনে প্রায় নতুন বাড়ি। সদ্য রং করা হয়েছে। খান তিনেক কামরা। বারান্দা, বাথরুম আবার ওরই মধ্যে একফালি উঠানও আছে।

সেই অনুপাতে ভাড়াও খুব বেশী নয়। দুশো কুড়ি। বাড়ির মালিক পাশের বাড়িতেই থাকেন।

এ বাড়ি আরতির পছন্দ হয়ে গেল।

শুধু আরতির নয়, আরতির স্বামী আশিসেরও।

আর দেরি না করে সে দিনই 'দু' মাসের ভাড়া আগাম দেওয়া হলো!

মাসখানেক পর আরতির বাসায় বেড়াতে গিয়ে খুব ভাল লাগল।

নতুন আসবাবপত্র দিয়ে চমৎকার সাজিয়েছে। উঠানের পাশে সারি সারি টব।

দেশি ফুল বেল, জুঁই যেমন আছে, তেমনি বিদেশী ফুল ডালিয়া, পপি, হলিহকও রয়েছে।

এমন বাসা খুঁজে দেবার জন্য আরতি-আশিস দুজনেই আমাকে বারবার ধন্যবাদ দিল।

এবপব অনেকদিন আরতির সঙ্গে দেখা হয়নি।

অফিসের কাজে দিল্লি যেতে হয়েছিল সেখানে মাস তিনেক কাটিয়ে কানপুব। সেখানেও একমাসেব ওপব লেগে গেল। কলকাতা ফিবলাম প্রায় পাঁচমাস পব।

এক ছুটিব দিনে বন্ধুবান্ধব দিয়ে গল্প করছি আবতি এসে ঢুকল।

প্রথম নজবেই মনে হলো চেহাবা একটু ম্লান। আরতি ভিতবে চলে গেল—

বন্ধুরা বিদায় হতে আমিও ভিতরে গেলাম।

দেখলাম, আরতি চুপচাপ সোফাব ওপব বসে আছে। আমাকে দেখে বলল—

আপনাব সঙ্গে কথা আছে।

কি বল? শবীব খাবাপ নাকি। চেহাবাটা কেমন দেখাচ্ছে আবতি মুখ তুলে বলল—

বাত্রে একেবাবে ঘুম হচ্ছে না।

সে কি। ডাক্তাব দেখাও, নইলে শক্ত অসুখে পড়ে যাবে।

—ডাক্তার কিছু কবতে পাববে না।

তার মানে?

মানে বাডিটা ভাল নয়।

সে কি, স্যাঁৎস্যাঁতে বা অন্ধকার এমন তো নয়! রোদ বাতাস প্রচুর।

সে সব কিছু নয় অন্য ভয় আছে।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আরতি কিছুক্ষণ কি ভাবল, তার পরে আস্তে আস্তে বলল ও বাড়িতে আমরা দুজন ছাড়াও অন্য একজন আছে।

অন্য একজন আছে?

হ্যাঁ তাকে মাঝে মাঝে গভীব রাতে দেখা যায়। অন্য লোক হলে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিত। শুনতেই চাইত না।

কিন্তু আমি মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আমার স্থির ধারণা, যারা অতৃপ্ত কামনা বাসনা নিয়ে এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় তারা আবার ফিরে আসে। কখনও বায়বীয় মূর্তি কখনও মানুষের রূপ ধরে ফেলে যাওয়া সংসারের মাঝখানে ঘুরে বেড়ায়।

কি ব্যাপার খুলে বল তো।

বলছি।

আরতি কোলের ওপর রাখা ভ্যানিটি ব্যাগটা পাশে নামিয়ে রাখল সহজ হয়ে বসে বলতে লাগল।

মাস দুয়েক আগে হঠাৎ খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। মনে হলো বাইরের ঘরে যেন কার পায়ের আওয়াজ। আশিস পাশেই শুয়েছিল। তার ঘুমের বহর তো জানোই। বুকের ওপর দিয়ে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য চলে গেলেও তার ঘুম ভাঙবে না।

কাজেই তাকে ডাকার চেষ্টা না করে নিজে উঠে পড়লাম। ভীতু এ বদনাম কেউ দিতে পারবে না। বরং সবাই জানে আমি রীতিমত সাহসী।

প্রথমে জানালা দিয়ে দেখলাম। কিছু দেখা গেলনা কিন্তু খুটখাট শব্দ ঠিক চলতে লাগল।

মনে হলো, খড়ম পায়ে দিয়ে কে যেন পায়চারি করছে।

অথচ কোন লোককে দেখা গেল না।

রাতের মাংস রান্না হয়েছিল। হাড়ের টুকরো রান্নাঘরে প্লেটের ওপর পড়েছিল, খুব সম্ভবতঃ ইঁদুর সেই হাড়ের টুকরো বাইরের ঘরে নিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম।

তখনই ঘুম এল না। একবার ঘুম ভেঙে গেলে চট করে ঘুম আমার আসে না। এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। পাশের লোকটি অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে। নাক দিয়ে বিচিত্র ধ্বনি বের হচ্ছে।

ঘরে হালকা সবুজ রঙের একটা বাতি জ্বলছিল। অন্ধকারে আমি ঘুমাতে পারি না। এ আমার ছেলেবেলার অভ্যাস।

হঠাৎ দেখলাম, দীর্ঘ একটা ছায়া আলোক আড়াল করে এ ঘর থেকে অন্য ঘরে চলে গেল।

চমকে উঠে বসলাম।

আশিসকে ডেকে বললাম।

এই ওঠ, ওঠ ঘরের মধ্যে কে ঢুকেছে।

আশ্চর্য মানুষ। চোখ খুলল না।

পাশ ফিরতে ফিরতে বলল—

ক্লিট দিয়ে দাও।

ছায়াটা সরে সরে বাইরের দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল। আর দেখা গেল না।

আমি তখন বিছানার ওপর উঠে বসেছি।

মনকে বোঝালাম এ শুধু চোখের ভুল, তা না হলে ছায়া দেখা গেল অথচ মানুষটাকে দেখা গেল না, তা কি হতে পারে।

ভূতের কথা ভাবতেও পারিনি, কারণ ভূত আছে এমন অদ্ভুত কথা আমি কোনদিন বিশ্বাস করি না। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে আরতির কথা শুনছিলাম।

এবার বললাম—তারপর?

তারপর দিন কুড়ি সব স্বাভাবিক, কোন গোলমাল নেই। সে রাতে ভয় পেয়েছিলাম ভেবেই হাসি পেত। একেবারে ছেলেমানুষি কাণ্ড।

আশিস কারখানার কাজে দিন চারেকের জন্য জামসেদপুর গিয়েছিল। বাড়িতে আমি একলা। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

এবারে একেবারে স্পষ্ট দেখলাম।

দীর্ঘ একহারা চেহারা। খালি গা। কাঁধের ওপর ধবধবে সাদা উপবীত। কোচাটা ভাঁজ করে সামনে গোঁজা।

মাথায় পাকা চুল। দুটি চোখ জবাফুলের মতো লাল। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ির মধ্যে দিয়ে উঁচু চোয়াল দেখা যাচ্ছে।

লোকটির উর্দ্ধদৃষ্টি। হাতে শক্ত একটা দড়ি। ওপর দিকে কি যেন খুঁজছে।

সেই মুহূর্তে শরীরের সব রক্ত জমে হিম শীতল হয়ে গেল। দুহাতে বুকটা চেপে ধরেও দ্রুত স্পন্দন কমাতে পারলাম না। মনে হলো তখনই হার্টফেল করব।

বিকৃত কণ্ঠে বললাম—কে কে ওখানে?

লোকটি ওপর থেকে দৃষ্টি নামিয়ে আমার দিকে দেখল।

জ্বলন্ত দৃষ্টি—পলকহীন।

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

তখনই মনে হলো লোকটা এ জগতের কেউ নয়, অশরীরী আত্মা।

আস্তে আস্তে লোকটা পাশের ঘরে ঢুকে গেল, আমি খাট থেকে নামলাম, কিন্তু তার পিছনে যাবার সাহস হ'ল না।

এই কথাগুলো বলবার সময়ে দেখলাম আরতির মুখচোখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

আমি বললাম—এরকম যখন ব্যাপার, তখন না হয় এবাড়ি ছেড়ে দাও।

অন্য কোথাও বাড়ি খুঁজি।

আরতি উত্তর দিল—

তাতেও তো মুশকিল, আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেননি বাড়ির দেয়াল ভেঙেচুরে আমি দুটো ঘর বাড়িয়েছি। বাইরেটা চুনকাম করেছি, ভিতরে রং দিয়েছি। গ্যাস বসাবার জন্য রান্নাঘরেরও অনেক অদল বদল করেছি। অবশ্য এসব বাড়িওয়ালার মত নিয়েই করেছি। ভাড়া থেকে মাসে মাসে কিছু করে টাকা কেটে রাখছি। সে টাকা শোধ

হতে বছর দুয়েক লাগবে। তার আগে বাড়ি ছেড়ে দিলে আমার অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে।

একটু ভেবে বললাম—

ঠিক আছে আমি একবাব তোমার বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করব। তিনি কি বলেন শুনি।

দিন দুয়েকের মধ্যেই বাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, বিপুলকায়। কলকাতায় কিছু বাড়ি আছে, কাঠের ব্যবসা।

একটা ইজিচেয়ারে বসেছিল। আমাকে দেখে ওঠবার চেষ্টা করল পারল না।

কি খবর? আমার কাছে হঠাৎ?

আরতির কাছে শোনা সব কিছু বললাম। শেষকালে জিজ্ঞাসা করলাম, ঠিক করে বলুন তো? ও বাড়িটার কোন দোষ আছে?

দোষ মানে?

মানে, কেউ ও বাড়িতে অপঘাতে মারা গিয়েছিলেন! আগের কোন ভাড়াটে?

বাড়িওয়ালা মাথা নাড়ল।

না মশায়, এর আগে মাত্র দুঘর ভাড়াটে ছিল। অপঘাতে তো দূরের কথা এমনিই মৃত্যু কারো হয়নি। তাছাড়া এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যখন পায়চারি করার জন্য চাঁদে যাচ্ছে, তখন কি সব ভূত প্রেতের কাহিনী আমদানি করেছেন।

তর্ক করলাম না। অনেক বিষয় আছে তর্ক করে বোঝান যায় না, স্থূল উদাহরণ দেওয়া যেখানে সম্ভব নয়।

চলো এলাম।

তারপর মাস দুয়েক আরতির কোন খবর নেই।

আমি নিশ্চিন্ত। যাক অপদেবতার উপদ্রব আর নেই সব শান্ত।

কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণ করে একদিন সকালে আশিস এল।

কোটরগত চোখে, বিবর্ণ মুখ ঘোলাটে দৃষ্টি। বললাম, কি হে শরীর খারাপ নাকি ? আরতি কেমন আছে।

আমার কথার উত্তর না দিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলল—
একটু জল দিন।

জল শুধু খেল না, মুখে চোখেও দিল। তারপর বলল, আরতিকে টালিগঞ্জে তার দিদির বাড়ি দিয়ে এসেছি। কালিঘাটের বাড়িতে আর আমাদের থাকা চলবে না।

কেন, কি হোল ?

আরতির কাছে তো কিছু কিছু শুনেছেন। আমি কিন্তু এপর্যন্ত কিছু দেখিনি। কোন শব্দও শুনিনি। সেইজন্য এতদিন আমি আরতিকে ঠাট্টা করতাম। তাছাড়া ভূত আত্মা সবে আমার কোনদিনই কোন বিশ্বাস নেই।

কাল একটা কাজে হাওড়ায় আটকে পড়েছিলাম। বাস বন্ধ, ট্যাক্সিও পাই না। কিছুটা হেঁটে তারপর ট্রামে বাড়ি পৌঁছতে প্রায় বারটা হয়ে গিয়েছিল।

আরতি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

যাক আরতিকে খাবার সাজাতে বলে আমি হাত মুখ ধোওয়ার জন্য বাথরুমে ঢুকে পড়লাম।

নীচু হয়ে বেসিনে মুখ ধুয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মাথায় ঠক করে কি একটা লাগল।

বাথরুমে আবার কে কি রাখল।

একটু কমজোর বাতি। কিন্তু সে বাতিতেও দেখতে কোন অসুবিধা হোল না।

ঠাণ্ডা একটা বরফের স্রোত আমার আমার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল।

বাথরুমটা অ্যাসবেসটসের ছাউনি দেওয়া। আগে টালির ছাদ ছিল। আমরাই খরচ করে অ্যাসবেসটস দিয়েছিলাম। ওপরে দুটো কাঠের বাড়ি।

একটা কড়িতে দেহটা ঝুলছে।

গলায় দড়ির ফাঁস। মাথাটা একদিকে কাত হয়ে পড়েছে। দুটো চোখ আধবোজা জিভটা অনেকখানি বের হয়ে গেছে। বোধহয় জিভের ওপর দাঁতের চাপ পড়েছিল। তাই জিভ কেটে রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়েছে। কিছুটা দেহের ওপর, কিছুটা মেঝেতে।

পরনে আধময়লা ধুতি, কাঁধে পৈতে।

মাথা উঁচু করবার সময় ঝুলন্ত দেহের পা আমার মাথায় ঠেকে গিয়েছিল। আমি সব কিছু ভুলে আরতি বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।

আরতি আমার অপেক্ষায় খাবার টেবিলে বসেছিল।

আমার চিৎকারে ছুটে এসে বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

প্রথমে সে ঠিক বুঝতে পারেনি!

তারপর ওপর দিকে চোখ যেতেই 'ও মাগো' বলে মেঝের ওপর ছিটকে পড়ে অজ্ঞান।

আরতির মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে কোনরকমে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম।

তারপর বাকি রাতটা দুজনে বাইরের ঘরে বসে কাটালাম। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে ট্রামে উঠে আরতিকে নিয়ে যখন তার দিদির বাড়ি এলাম, তখন জ্বরে আরতির গা পুড়ে যাচ্ছে, দুটো চোখ করমচার মতন লাল।

আমি চুপ করে সব শুনলাম।

আশিসের কথা শেষ হতে জিজ্ঞাসা করলাম, আরতি এখন কেমন আছে?

খুব ভাল নয়। বিকারের ঘোরে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে, ওই লোকটা, ওই লোকটাই তো ঘুরে বেড়াচ্ছিল দড়ি হাতে। আমি এখানে থাকব না। আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চল।

অবশ্য আরতির জন্য খুব চিন্তা নেই। ভয়টা কেটে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সব কিছু নিজের চোখে দেখাবার দারুণ ইচ্ছা হলো।

এমন তো নয়, এক সময় দরজা খোলা পেয়ে বাইরের কোন লোক বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে আত্মহত্যা করছে ?

সে হয়তো আত্মহত্যা করবার নির্জন একটা জায়গা খুঁজছিল।

তাই আশিসকে বললাম—

চল একবার নিজের চোখে দেখে আসি। তাছাড়া তোমরা ব্যাপারাটাকে ভৌতিক ভাবছ, তাতো নাও হতে পারে। পুলিসে খবর দেওয়াও তোমাদের একটা কর্তব্য। তারা এসে মৃতদেহের ভার নেবে।

আশিস আমার সঙ্গে চলল।

তারা খুলে ভিতরে ঢুকলাম।

বাথরুমের মধ্যে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। কোথাও কিছু নেই সব পরিষ্কার।

আশিসকে জিজ্ঞাসা করলাম—

কই হে ? কোথায় তোমার ঝুলন্ত দেহ ? রক্তের একটি ফোঁটাও তো কোথায় দেখছি না।

আশিস রীতিমত অপ্রস্তুত।

সব চোখের ভুল, বুঝলে ?

আশিস মাথা নাড়ল।

কিন্তু দু'জনেই ভুল দেখলাম ?

ওরকম হয়। একজনের ভয় আর একজনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তাকেও এক ধরনের কাল্পনিক দৃশ্য দেখায়। তুমিও দেখ না কাল রাতে তুমি যদি সত্যিই ওরকম একটা দৃশ্য দেখে থাক, তাহলে আজ কোথাও কিছু নেই, তা কি হতে পারে ? এইখানটাই তো দেখেছিলেন।

মুখ তুলে ওপরের দিকে দেখেই আমি থেমে গেলাম ?

কি আশ্চর্য, এটা তো আগে দেখিনি। কড়ির সঙ্গে একটা মোটা দড়ি বাঁধা। দড়িটা ফাঁসের আকারে ঝুলছে।

অস্বীকার করব না, আমার হাত পা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বুকের দাপাদাপি এত জোরে যে ভয় হলো, স্পন্দন থেমে না যায়। এ দড়ির ফাঁস তো প্রথমবার দেখিনি। আরও অবাক কাণ্ড দড়ির ফাঁসটা 'অল্প দুলছে' অথচ কোথাও বাতাস নেই।

বাইরে বাতাস থাকলেও বাথরুমে বাতাস ঢোকবার কোন সুযোগই নেই।

আশিসের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

এটা যে ভৌতিক ব্যাপার নয়, কোন মানুষের কারসাজি তা হওয়াও সম্ভব নয়। কোন যুক্তিতর্ক বিস্তার করেও সমাধান করতে পারলাম না।

আরতিরা আরও বাড়িতে ফিরে যায় নি। ভবানীপুরে একটা বাড়ি ঠিক করে উঠে গিয়েছিল। আর্থিক লোকসান সত্ত্বেও।

এ ঘটনার প্রায় মাস তিনেক পর এক বিকেলে কালিঘাট পার্ক দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ আরতির বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বেঞ্চে বসে আছে।

আমি তার পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম—মশাই, সত্যি কথা বলুন তো। বাড়িটার কি রহস্য? আমার আত্মীয়টি তো থাকতে পারল না, পালাল।

প্রথমে কিছুতেই বলবে না। অবশেষে আমার পীড়াপীড়িতে বলল।

এক বুড়ো ভদ্রলোক ওই বাড়িতে আত্মহত্যা করেছিল। তা প্রায় বছর দশের আগে। পেটে শূল বেদনা ছিল। বাড়ির সবাই নিমন্ত্রণ খেতে বাইরে গিয়েছিল, তখন বাথরুমে বুড়ো গলায় দড়ি দেয়। তারপর থেকে ভাড়াটে আসে, তারাই ভয় পায়। বেশীদিন থাকতে পারে না।

আমি বললাম—

গলায় পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করেননি কেন!

করার চেষ্টা করেছি মশাই। অনেকবার করেছি। প্রত্যেকবার এক-একটা বিপদ। বুড়োর আত্মীয়রা গয়া গিয়েছিল পিণ্ড দিতে, তিনদিন ধরে দারুণ ঝড় বৃষ্টি। ধর্মশালা থেকে বের হতেই পারল না।

আমি নিজে একবার গিয়েছিলাম। ট্রেন থেকে স্টেশনে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে একমাস হাসপাতালে শয্যাগত।

পুরোহিত দিয়ে শান্তি স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করার চেষ্টা করে ছিলাম। সেখানেও বিপত্তি।

পুরোহিত আসনে বসবার সঙ্গে সঙ্গে ছাদ ভেঙ্গে একটা চাঙড় তার মাথায় পড়ল। পুরোহিত জ্ঞান হারিয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

ব্যস, তারপর থেকে আর কোন পুরোহিত আসতে রাজী হলো না। কি করি বলুন তো?

সে উত্তর জানা ছিল না। কাজেই সেদিন বাড়িওয়ালার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিনি। একটা কথা শুধু মনে হয়েছে। পৃথিবীর সব অবিশ্বাসী মানুষদের জড় করে চিৎকার করে বলি, যাঁরা মনে করেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হয়ে যায়, প্রেতযোনি বলে কিছু নেই, তাঁরা কালীঘাট অঞ্চলের এই বাড়িটায় রাত কাটিয়ে যান। বাড়িটা এখনও খালি।

ঠিকানা আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন অবশ্য আমি ভাল মন্দ হয়ে গেলে কোন কিছুর জন্য দায়ী থাকব না। এই মনে আমাকে একটা লিখিত চুক্তি পত্র দিতে হবে।

চেতলার কাছে

চেতলা, কালীঘাট, আদিগঙ্গা ইত কেন, ওসব জায়গা মোটে ভাল না ! আর লোকের মুখে মুখে কী সব অদ্ভুত গল্পই যে শোনা যায়, তার লেখা-জোখা নেই, তাছাড়া মশা-মাছি তো আছেই। চিল্‌তে চিল্‌তে সব গলি, তাতে মান্ধাতার আমলে তৈরী ঝুরঝুরে সব বাড়ি। তায় আবার সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির উঠোন দেখা যায়। একফালি উঠোনের মধ্যে এই বড় বড সব গাছ,—তালগাছ, আমগাছ, বটগাছ, তাদের ডালপালা বেয়ে, ঝুরি ধরে ঝুলে যে কোন বাড়ি থেকে যে কোন বাড়িতে চলে যাওয়া যায়। বিপদ বুঝলে একটা হাঁক দিলেই হল। সবাই সাত পুরুষ ধরে সবার চেনা। পুরনো সব ঝগড়াও আছে, তার কারণ নিজেরাই ভুলে গেছে, তবু এখনো কথাবার্তা বন্ধ। মুখ দেখা আর কী করে বন্ধ, নড়বড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই, সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির রান্নাঘরের ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়, কার বাড়িতে কী রান্না হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই চোর ছ্যাঁচর খুনে জানতে পারবে। একটা টিকটিকি লুকোবার কোথাও জায়গা নেই, দুষ্কৃতকারীদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। কার ঘরে চুরি করার মতো কী আছে এবং কোথায় আছে তাও সবাই জানে। নেইও অবিশ্যি কারো কিছু। সেদিক দিয়ে জায়গাটাকে চোরেদের গোবি মরুভূমিও বলা যায়।

আমার বন্ধু বটুর বড়কাকা ওখানকার থানার মেজ দারোগা তাছাড়া ওদের সাত পুরুষের বাড়িও ওখানে। নাকি বাড়ি হবার সময় ক্লাইব জন্মায় নি। বটু জায়গাটার নাম দিয়েছে মিসার হতাশা। শুনে

করার চেষ্টা প'ড়েছেন, তুষ্কৃতকারীরাই যদি একটু সুযোগ না
এক-একটা হিড আপিসে উন্নতি হয় কী করে? অবশ্যি ও সব
তিনদিনসর চাইতেও অন্য এবং আরও ভয়ের জিনিস আছে, ঐ
না ড়াসুদ্ধ সবাই সন্ধে হতে যার ভয়ে জুজু। অধিকাংশই ওপর
একগোছা সঙ্কট তারিণী মাতুলি বেঁধে নিরাপত্তা রক্ষা করেন।
।রণ পুলিসে আর কী-ই বা করতে পারে?

বটুদের উঠোনের আম পাকলে বটু আমাকে তিন দিনের জন্য ধরে নিয়ে গেছিল। ঐ তিনদিনে আমি যতগুলো সত্যিকার ভূতের গল্প শুনলাম, সারা জীবন ধরে অত শুনিনি। সবাই সবার পাশের বাড়িতে অশরীরীদের দেখে।

কী বড় বড় সবুজ রঙের চিংড়ি মাছ নিয়ে একটা লোক বিক্রি করতে এল। চিল-কোঠায় পূজো করতে বসে তাকে দেখেই বটুর ছোট ঠাকুমা চ্যাচাতে লাগলেন, "না বাছা, এস্থানে ও মাছ কেউ খাবে না। তুমি অন্য জায়গায় দেখ।"

বটুতো চটে কাঁই, কী ভালো ভালো চিংড়ি মাছ। ছোট ঠাকুমা নেমে এসে বললেন, "বাস্, মাছ দেখেছিস তো অমনি হয়ে গেল। আরে ওকি সত্যিকার মাছ? অতবড় চিংড়ি কখনো চার টাকায় দেয় কেউ? আবার বলছে পরে নেবে।"

বটু বলল, "আহা, বলল যে বিক্রি না হলে পচে যাবে" কাষ্ঠ হেসে ছোট ঠাকুমা বললেন, "তুইও যেমন। তাছাড়া ওগুলো, মাছও নয়, ঐ জেলের পো-ও মানুষ নয়, সব ইয়ে।' এই বলে ছোট ঠাকুমা জল খেতে বসলেন।

বটুও বলল, "তা সত্যিও হতে পারে, মুখটা কেমন মিচ্‌কে মতো দেখলি না?"

আমি বললাম, "যাঃ। ভূতের হাঁটু উল্টোদিকে থাকে আর ওদের ছায়া পড়ে না।"

ছোট ঠাকুমা শুনতে পেয়ে ডেকে বললেন, "ইদিকে এখনো রোদ

আসেনি বাবা, ছায়া দেখবে কী করে? সে যাই হোক, আদি গঙ্গার বটগাছের তলায় যেন কখনো যাস্‌নি। জায়গাটা ভালো নয়।"

গিজগিজে সব বাড়ি, বটগাছ তলায় যেতে হলে সারকাস করতে হয়। অথচ সেখানে নাকি কারা কাপড় কাচে, ঝগড়া করে, মাছ ধরে।

ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে, সামনের দোতলায় লটখটে বারান্দায় তুজনে গল্প করছি। ছপ্‌ করে কী একটা পায়ের কাছে পড়ল। আর সে কী সুগন্ধ ভুরভুর করতে লাগল। তুলে দেখি কলাপাতায় মোড়া বড় বড় চিংড়ি মাছ ভাজা। নীচের দিকে চেয়ে দেখি, সেই মিচ্‌কে লোকটা মিট মিট করে হাসছে। মোটা মোটা কান, নাকে মস্ত আঁচিল। একতলার বৈঠকখানা থেকে বটুর পিসেমশাই ডেকে বললেন, "কে?" কে ওখানে?" সঙ্গে সঙ্গে কেউ কোথাও নেই। খেয়ে ফেললাম তুজনে মিলে সব কটা চিংড়ি মাছ। যদি ওগুলো চিংড়ি মাছ নাও হয়, তবু খেতে বেজায় ভালো।

ভিতর দিকের উঠানে আম গাছের গায়ে লাগা বুড়ো তালগাছ। ছোট—ঠাকুমা সাদা রেকাবি করে খোয়া ক্ষীর, চিঁড়ের মোয়া আর বড় বড় মনাক্কা নিয়ে, তালগাছের কোটরে রেখে, ভক্তি ভরে গলায় কাপড় জড়িয়ে প্রণাম করলেন। ছোট ঠাকুমা চলে যেতেই বটু বলল, "ব্রহ্মদত্যিকে তোয়াজ করা হচ্ছে। তালগাছে সে বাস করে।"

আরও কী বলতে যাচ্ছিল বটু, ছোট ঠাকুমা পিছন থেকে বললেন, "অমন অছদ্দা করিস্‌নে বাছা। উনি আমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের ছোট ভাই। চটিয়ে দিলে সব্বোনাশ করবেন, খুশী রাখলে আমাদের জন্য না পারেন এমন জিনিস নেই। ঐ বিদ্যে বুদ্ধি নিয়ে বছরে বছরে পাস করে যাচ্ছিস্‌, সেটা কী করে সম্ভব সে কথা কখনো ভেবেছিস? "হুঃ।" এই বলে ছোট-ঠাকুমা গীতা পড়তে ঘরে গেলেন। যাবার সময় আরো বলে গেলেন, "তোরা বিশ্বাস না করতে পারিস্‌,

কিন্তু রোজ উনি এই জিনিস গ্রহণ করেন, আর তার বদলে একটি পয়সা আশীর্বাদী”—

আর বলা হল না’ কারণ সেই সময় বড়কাকা বাড়ি এলেন।

বড় কাকা খুব চটে ছিলেন। চা আর চিঁড়ের মোয়া খেতে খেতে বললেন, “এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে। বাজারের লোকদের নালিশের জ্বালায় আর টেঁকা যাচ্ছে না। গোলাবাড়িতে রাতে তদন্তে যেতে হবে।” তাই শুনে বড়কাকী এমনি চমকে গেলেন যে, হাতের দুধের হাতা থেকে অনেকখানি দুধ মাটিতে পড়ে গেল। চোখ গোল গোল করে ফ্যাকাশে মুখে বললেন, “কিন্তু, কিন্তু—”

বড়কাকা কাষ্ঠ হাসলেন, “কিছু কিন্তু কিন্তু নয়। এর ওপর আমার প্রমোশন নির্ভর করছে। কোনো ভয় নেই, ছটা গুণ্ডা লোক সঙ্গে থাকবে। হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে।”

বটার কাছে শুনলাম যে, বাড়িটাতে একশো বছর কেউ থাকে না। বড়ই দুর্নাম। নাকি ওটা চোরাচালানকারীদের গুহ্য আড়ত। মাটির তলায় সুড়ঙ্গ আছে, বুড়ীগঙ্গায় তার মুখ। অনেকে দেখেছে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে সোনাদানা বে-আইন জিনিস বস্তা বস্তা পাচার করা খুব শক্ত নয়। বাজারে নাকি ওদের চর ঘুরে বেড়ায়, কখনো জেলে সেজে, কখনো পুরুত ঠাকুর সেজে; এটা ওটা কিনতে চায়, চা খেতে চায়, অচল পুরনো পয়সা দিয়ে দাম দিতে চায়। তা লোকে শুনবে কেন? দিয়েছে নালিশ করে। বড়কাকা বলেছিলেন, “লোকটাকে ধরা যায় না। ফুস্‌ফাস করে এখন দিয়ে ওখনে গলে পালায়। কোনো দোকানদারের সঙ্গে ষড়ও থাকতে পারে। শুনেছি চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়, কীরকম—মিচকে মতো, মোট মোটা কান, নাকের ডগায় আঁচিল।”

শুনে আঁতকে উঠেছিলাম, বটা কনুইয়ের গুঁতো মেরে থামিয়ে দিয়েছিল। আটটা বাজতেই মহা ঘটা করে আটজন সশস্ত্র লোকজন নিয়ে বড়কাকা তদন্তে চলে গেলেন। ছোট ঠাকুমা তাঁর গলায় হলদে

সুতো দিয়ে একটা বেলপাতা ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, ব্যাস্ আর ভয় নেই। সেখানে গিয়ে কেউ কিছু দিলে খাস্‌নে যেন। দুগ্‌গা দুগ্‌গা"। বড়কাকা চলে গেলে বললেন 'কামান দেগে হাওয়া ধরা। হুঁ!"

আমরা ছাদে গিয়ে বুড়ী গঙ্গায় জোয়াব আসা দেখতে লাগলাম বটু বলল, "ঐ গোলাবাড়ীটা আমার ঠাকুরদার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ছোট ভাই পেয়েছিল। ব্যাটা মহা লক্ষ্মীছাড়া ছিল, লেখাপড়া শেখেনি, কাজকর্ম করত না, খালি মাছ ধরার বাই ছিল আর চীনে ব্যবসাদাবদেব কাছ থেকে চায়েব নেশা করেছিল। দুদিনে বাড়ীর সব ঝাড়বাতি, আসবাব পত্র, কাপোব বাসন, বেচেবুচে সাফ করে দিল ওব বুড়ী মা নাকি খুচরা পয়সা কড়ি এমনি লুকিয়ে রেখে চোখ বুজে-ছিলেন যে, ব্যাটা সে সব খুঁজেই পায়নি। এখনো নাকি খুঁজে বেড়ায়। তাই ও বাড়িতে কেউ রাত কাটায় না। সেইখানে গেছে বড়কাকা তদন্ত করতে। খুচরো টাকাকড়ির বাক্সটা পেলে মন্দ হয় না। আমরাই তো ওর ওয়ারিশ। সে ব্যাটাতো বিয়েই করেনি। নাকি বিশ্রী দেখতে ছিল, সুঁট্‌কো, কালো বড় বড় কান, চাকর চাকর চেহাবা। গেঞ্জি গাযে ঘাটে বসে অষ্টপ্রহর বুড়ী গঙ্গায় মাছ ধরতে— কে। কে ওখানে।"

খচমচ কবে তালগাছ থেকে আমগাছ, আমগাছ থেকে নড়বড়ে বারান্দা কাঁপিয়ে মিচ্‌কে লোকটা হাসি হাসি মুখ করে উঠে এসে নাকের ফুটো ফুলিয়ে ফোঁস-ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিয়ে চলল, চা চা' গন্ধ পাচ্চি মনে হচ্ছে।"

সত্যিই ছিল চা। দোকানের কেত্‌লিতে একটু চা আর একটা মাটির ভাঁড় বটু লুকিয়ে এনেছিল সামনের দোকান থেকে। নীচে নামাতেও হয়নি, ওদের ছোকরা তেঁতুলগাছে চড়ে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, রোজকার মতো।

চা পেয়ে লোকটা আহ্লাদে আটখানা, মিচ্‌কে মুখ যেন সাত ভাঁজ হয়ে গেল। বললাম, "পেঁয়াজি খাবে নাকি।"

জিব কেটে বলল, অ্যাঁ, ছি ছি ও নাম করবেন না। আমার বরাদ্দ রোজগার মতো খেয়েই এসেছি, চিঁড়ের মোয়া, খোয়া ক্ষীর মেওয়া—"

বটা আর আমি এ ওর দিকে তাকালাম, কিছু বললাম না। থাক না বেচারী।

মিচ্‌কে লোকটি বলল, 'বড়কর্তা আমাদের ওখানে এমন হাঁকডাক লাগিয়েছেন যে, টিকতে না পেরে ওনার এখানে গা ঢাকা দিতে এসেছি। দেখ দাদা, তালগাছের মুড়োয় তোমাদের জন্য একটা দ্রব্যি রেখে গেলাম। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। সেখানে মা অমৃতি বানায়।

বটু ব্যস্ত হয়ে বলল, "কেন চলে যাবে। এখানে বুঝি খেতে পাও না।"

ফিক করে হেসে মিচ্‌কে লোকটা বলল, "তুবেলা নৈবিষ্যি পাই আবার কষ্ট কিসের? ঐ এল বলে আমি উঠি।" বলেই হাওয়া।

নীচে বড়কাকাদের রাগ রাগ গলার হাঁক-ডাক শোনা গেল। নিশ্চয় কিছু তুষ্কৃতকারীটারি ধরতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে আদ্যি-কালের তালগাছটা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল। পোকা ধরা, পুরানো গুঁড়ি ভেঙ্গেচুরে একাকার। তার মধ্যে দেখা গেল বেশ বড় একটা কাঠের হাতবাক্স, পুরানো টাকা কড়িতে তার অর্ধেক ভর্তি। আব চাঁচা পোঁছা নৈবেদ্যের রেকাবিটা, তিন টুকরো হয়ে পড়ে আছে। বড় কাকার রাগ ঠাণ্ডা।

পরদিন বড়কাকা বললেন, "আশ্চর্য্যের বিষয়, সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা খোপে ঐ বাক্স রাখার স্পষ্ট দাগ দেখলাম। সেই বুড়ি ঠাকরুণ তাহলে বাউণ্ডুলে ছেলের হাত থেকে ওটাকে বাঁচাবার জন্য এখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এটাও তো তাঁদেরই বাড়ি।

ছোট ঠাকুমা শূন্যে নমস্কার করে বললেন, "কত বাঁচিয়ে ছিলেন সে তো বোঝাই যাচ্ছে! ও বটা, নিজে পড়িস দাতু, সে তো গেল।" ফোঁত ফোঁত করে একটু কেঁদেও নিলেন। বড়কাকা তো অবাক।

●

জঙ্গল বাড়ীর বৌরাণী

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অনেক দিন থেকেই সাধ, অকূল বিশাল কোনো নদীর উপর পান্‌সি ক'রে কয়েকটা দিনরাত্রি খেয়াল মতো স্রোতে ভাসিয়ে কাটিয়ে দেব। অনেক দিন থেকে—মানে 'ছিন্নপত্র' পড়া অবধি। সেই যে কয়েকটা ছেঁড়া ছেঁড়া আলগা ছবি ছেলেবেলায় চোখের উপর ভেসে উঠেছিল, চাঁদের আলোয় স্বপ্নের মতো বিছিয়ে থাকা বালুচর, মাঝ রাতের অন্ধকার কাঁপিয়ে বুনোহাঁসের পাখার শব্দ—সে আর মন থেকে কোনো কিছুতেই মুছে যায় নি। সে-সব মধুর নামগুলোও ভুলি নি! শিলাইদহ তো পৃথিবীর কোন জায়গা বলে মনে হয় না আমার এখনো। সে যেন কোন রূপকথার ভৌগোলিক নাম। আমার ছিন্নপত্রের 'পদ্মায়' তো বেলি ব্রাদার্সের পাটের ষ্টিমার যায় না, সে-পদ্মা সাত সমুদ্দুর তেরোনদীর একটি—রুপো-গলানো, তার জলে ঢেউ তুলে মধুকরের সপ্তডিঙাকে বড় জোর আমার মন ছেড়ে দিতে পারে দূর-সিংহলে বাণিজ্যে যেতে।

ছেলেবেলায় সে সাধ হঠাৎ এবার পূরণ হয়ে গেল। একেবারে পুরোপুরি পূরণ হয়ে গেল, তা বলতে পারিনা, কারণ নদীটা পদ্মা নয়—ধলেশ্বরী। তাতে কিন্তু এমন কিছুই এসে যায় না। সব নদীই আশ্চর্য্য নদী, এপার থেকে ওপার ঝাপসা দেখলেই হোল, ফুলে উঠলেই হলো হাওয়ায় দূরের নৌকোর পাল, আর রাতের অন্ধকারে চঞ্চল জলের স্রোতে ভেসে গেলেই হলো তাদের ছায়া।

বরং আসল পদ্মার ঠিক শিলাইদহ নামটি ধরে খোঁজ করতে গেলেই খারাপ হতো। মনের ছবির সঙ্গে চোখের ছবির কেবল লাগতো

কাটাকাটি—মারামারি, আমার স্বপ্ন যেত ভেঙে, আর স্মৃতিও জমতো না মধুর ক'রে। আর আমার ধলেশ্বরীর বা অভাব কিসের। সেও ছোট খাট রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে বর্ষার প্লাবনে ভাঙ্গন ধরায় লোকালয়ের কূলে। তার বুকে চর জাগে স্বপ্নের মতো, চখা-চখির ডাকে তার দুকূল কেঁদে ওঠে অন্ধকার রাত্রে।

মাঝারি সাইজের একটি পান্‌সি ভাড়া করে নিলাম। মাঝি মাল্লা, চাকর বাকর নিয়ে সবশুদ্ধ আমরা ছ'জন মাত্র।

এত লোকেরও বুঝি দরকার ছিল না। বিনা তাড়াহুড়োয় ধীরে সুস্থে যেমন খুশি, ভেসে যাওয়াই ছিল আমাদের কাজ, বড় বড় গঞ্জে কি লোকালয়ে ভীড় করা ঘাটে নয়, শূন্য-নির্জন তীরে তীরে। শুধু পাখীর ঝাঁক-বসা চড়ার ধারে ধারে। তার জন্যে একা চরণ মাঝিই যথেষ্ট। অধিকাংশ সময়েই তো আর সবারই ছুটি, একা চরণ বসে থাকে হালে কাঠের মূর্তির মতো। শুধু যখন মেঘনার মোহনায় গিয়ে পড়বার উপক্রম হলো তখন স্রোতের উজান ঠেলে যেতে দাঁড়ে হাত হয় অন্য মাঝিদের।

'ছিন্নপত্রে'র স্বপ্নের কুয়াসা মনের মধ্যে না থাকলে পান্‌সির জীবন বেশ পান্‌সে হয়ে উঠতে পারতো? গরমিল তো কম নয়। 'ছিন্ন পত্রে'র পদ্মায় কচুরি পানার কুৎসিত জঙ্গল দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তা ছাড়া রামসেবকের রান্না থেকে চরণ মাঝির চেহারা পর্যন্ত খুঁত ধরবার অনেক কিছু ছিল, কিন্তু আমি ছিলাম ও সবের প্রায় ওপরে।

প্রায় ওপরে, এই জন্যে বলছি যে, চরণ মাঝির চেহারাটা সব সময়ে ঠিক স্বাভাবিক ভাবে বরদাস্ত করতে পারতাম না। এক-এক সময়ে নিজের অজান্তেই বুঝি শিউরে উঠেছি। যখন মাঝ রাত্রে আর সবাই গড়িয়ে পড়েছে পান্‌সির খোলে, আর মেঘঢাকা চাঁদের আলোয় ধলেশ্বরী থম থম করছে, তখন মিশরের মমির মতো শুধু চরণ আছে নিস্পন্দ ভাবে হালে। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ মনে হয়েছে,

আবার সেখানেই ফিরে যাই। সেখান থেকে তবু অন্য মাঝিদের নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়। তাতেও যেন অনেকখানি ভরসা।

সত্যি, জ্যান্ত মানুষের এমন অদ্ভুত মরা চেহারা হতে পারে, এ আমি আগে কখনো জানতাম না। রঙ তার কালো বলে নয়, কালো তো সব মাঝিই, কিন্তু তার চামড়ায় যেন অপার্থিব বিবর্ণতা। যেন অনেক দিন মাটির তলায় সে চাপা পড়ে ছিল। এই সবে মাত্র যেন উঠে এসেছে শ্যাওলাধরা ভিজে-মাটি মুছে গা থেকে।

লোকটার ধরন-ধারণও অদ্ভুত। কথা সে খুব কমই নয়, অত্যন্ত ভারি হাঁড়ির মতো গলায় শুধু একটু-আধটু 'হাঁ না' ছাড়া আর কিছু বলতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। অন্য মাঝিদের সাথে তার মেলা-মেশাও নেই তবুও সবাই যেন একটু সভয়ে তাকে সমীহ ক'রে দূরে রেখে চলে, সে কেবল তার মরা-চামড়া সত্ত্বেও দৈত্যের মতো বিশাল চেহারার জন্যে।

সেদিনও মেঘে-ঢাকা ভাঙা-চাঁদের মরা-জ্যোৎস্নায় চারিদিক ছমছম করছে। দেওয়া

সন্ধ্যে থেকেই মাঝিদের মধ্যে একটু ফিস ফিস শুনছিলাম একটু হতেই তার কারণটা বোঝা গেল। কখন ফিরলে।

একজন মাঝি সাহস ক'রে এগিয়ে এসে,কান মা আমতা ক'রে জানালে যে, আমি যদি তাদের ছুটিওপর রেখে গম্ভীর স্বরে একটু ভালো 'যাত্রা' শুনে আসে।

'যাত্রা' কোথায় হচ্ছে, হেসে জিজ্ঞাসা অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা আগে যে গঞ্জ আমরা পেরিয়ে এসেছি, সেই আসাটা আমার ভালো জাদা এক দল এসেছে। এমন 'যাত্রা' শো সহজে মিলবে না। 'আমার মুখের ভা বললে—দেখেছেন। যাওয়ার প্রস্তাব ক'রে ফেলে এবার। সেদিন রাত্রি শেষে যে অদ্ভুত

হেসে বললাম-না মাঝির-পা, আমাই ক'রে এসেছে আমার জীবনে,

শুনে আসতে পার, ইচ্ছে হয়েছে যখন, কিন্তু গঞ্জের ঘাটে তো আমি থাকতে পারব না।

মাঝি তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে জানালে যে, আমায় সে কষ্ট তারা দেবে না। এখান থেকে কতটুকু আর পথ, তারা পাড় দিয়ে হেঁটেই যাবে। যাত্রা ভাঙলেই ফিরে আসবে ভোর বেলায়, কিন্তু আমার ভয় করবে না তো?

হেসে বললাম—তা যদি একটু করে মন্দাকিনি!

মাঝি সাহস দিয়ে জানালে—এখানে ভয়ের অবশ্য কিছুই নেই; জলঝড়ের সময় নয়, নৌকো নোঙর বাঁধা থাকবে নিরাপদ জায়গায়।

হঠাৎ কেন যে জিজ্ঞাসা করলাম জানি না—চরণ মাঝি যাচ্ছে তো তোমাদের সঙ্গে?

মাঝির মুখে 'যাচ্ছে বই কি কর্তা' শুনে কেমন যেন আশ্চর্য বোধ করলাম বলেই একটু লজ্জিত হলাম।

মাঝিরা সব চলে যেতেই একবারে পান্‌সির কামরায় ছাদে উঠে গিয়ে বসেছিলাম। এমন অপরূপ নির্জনতা ভোগ করার সৌভাগ্য
হয় অং
খনো তো হয় নি। মাঝিরা সবাই চলে গেছে, হিন্দুস্থানী ঠাকুর রাম
'ছিন্নপ
ও পর্যন্ত সঙ্গে গেছে হুজুকে পড়ে। দূরে কোথাও একটা ছুটো
বেশ পানসে
লো পর্যন্ত নেই, বিশাল ধলেশ্বরীর বুকে আমি একা—এ-
পত্রে'র পদ্মায় কচু
কেমন যেন পুলকের রোমাঞ্চ হয়।
না। তা ছাড়া রামসেং
রোমাঞ্চ কিন্তু পরে সেটা রইল না।
খুঁত ধরবার অনেক কিছু
ধ্যান করতে করতে কখন বোধহয় একটু ঘুমিয়ে
ওপরে।
খি, চারিদিকের দৃশ্য বেশ বদলে গেছে, ভাঙা
প্রায় ওপরে, এই জন্যে বল
লে পড়ে কেমন যেন ফ্যাকাশে হলদে হয়ে
ঠিক স্বাভাবিক ভাবে বরদাস্ত ক
দে চাঁদের আলোয় কূলহীন ধলেশ্বরীর রুগ্ন
নিজের অজান্তেই বুঝি শিউরে উঠে
কর লাগল। একটা নাম-না-জানা পাখি
গড়িয়ে পড়েছে পান্‌সির খোলে,
র মতো ডাকছেড়ে উড়ে গেল। শিউরে
ধলেশ্বরী থম থম করছে, তখন মি
নিস্পন্দ ভাবে হালে। কামরা থেকে

বুঝলাম এতক্ষণ এই খোলা জায়গায় শুয়ে ঘুমানো উচিত হয়নি। অনেকক্ষণ হিম খেয়ে শরীরটা কেমন যেন ম্যাজমেজে হয়ে উঠেছে, মনটাও সেই সঙ্গে।

ওপর থেকে নামতে যাচ্ছি, হঠাৎ থমকে গেলাম। এদিকে এতবড় একটা বিশাল পোড়ো বাড়ি ছিল নাকি! বাড়ি না বলে তাকে প্রাসাদই অবশ্য বলা উচিত। ফাটলধরা বিশাল দেওয়ালগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েও এখনো যেন আকাশ আড়াল ক'রে আছে। বুঝলাম এতক্ষণে জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় এই পোড়ো-প্রাসাদ কুয়াশায় মিশেছিল, চাঁদ এখন তার পিছনে গিয়ে পড়তেই অন্ধকারের দৈত্যের মতো জেগে উঠেছে। এই পোড়ো-প্রাসাদ সম্বন্ধে কাল মাঝিদের কাছে খোঁজ নিতে হবে ভেবে আবার নামতে গিয়েও থামতে হলো।

পেছনে কি একটা ঝন্‌ঝন্ করে শব্দ হলো যেন। সত্যি বলছি, এবার ফিরে চেয়ে গায়ে একটু কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। নিজেকে একেবারে একা বলে জানবার পর হঠাৎ পেছন ফিরে আর একটি লোককে অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করলে গায়ে কাঁটা দেওয়া অস্বাভাবিক বোধ হয় না।

একি চরণ। প্রায় ধরা গলায় বললাম—তুমি কখন ফিরলে। যাত্রা দেখলে না?

সে শেকল-সমেত নোঙরটা তুলে পান্‌সির ওপর রেখে গম্ভীর স্বরে বললে—না!

কিন্তু নোঙর তুললে কেন?—অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তার এভাবে একলা ফিরে আসাটা আমার ভালো লাগছিল না।

সে সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে—দেখেছেন।

দেখিনি, কিন্তু এইবার দেখলুম। সেদিন রাত্রি শেষে যে অদ্ভুত অসাধারণ সবঘটনা একসঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে এসেছে আমার জীবনে,

তখন তা যেমন ভালো ক'রে বোধহয় বুঝি নি।

পাড়ের ওপর জলের একেবারে কিনারায় একটি দীর্ঘ নারী-মূর্তি ব্যাকুলভাবে আমাদের হাত নেড়ে ডাকছে।

কে ও? জানো নাকি! প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলাম বিস্ময়ে-উত্তেজনায়। হাল ঘুরিয়ে নৌকো সেই পাড়ের কাছে ভিড়াতে চরণ শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

পাড়ে ভিড়তে না ভিড়তে মহিলাটি যেন পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে এসে পান্‌সিতে উঠলেন। আমার কাছে এসে তারপর ভীত—ব্যাকুলস্বরে বললেন—আমায় বাঁচান! আমায় বাঁচান। দোহাই আপনার।

সে-অবস্থায় যতদূর সম্ভব স্থির হয়ে বললাম—আমার যতদূর সাধ্য, চেষ্টা করব, কিন্তু কি ব্যাপার, আমার একটু জানা দরকার। আপনি আমার সঙ্গে কামরায় চলুন।

আঁচল ঢাকা দিয়ে কি যেন একটা ভারি জিনিস তিনি বয়ে এনে ছিলেন। কামরায় চৌকাঠের কাছে সেইটের ভারে একটু হোঁচট খেতে ভদ্রতা ক'রে বললাম—ওটা বড্ড ভারি বোধহয়। আমার হাতে দিতে পারেন।

তিনি এ-কথায় এমন আঁত্‌কে উঠে পিছু হটে দাঁড়াবেন জানলে নিশ্চয়ই ও-কথা বলতাম না। তাই একটু বিমূঢ়ভাবেই নিজের কামরায় ঢুকে লণ্ঠনটা আর একটু উজ্জ্বল ক'রে দিলাম।

নিজের ব্যবহারে তিনিও বোধহয় একটু লজ্জিত হয়েছিলেন। ঘরে ঢুকে আঁচলের আড়াল থেকে একটা অদ্ভুত-আকারের বাক্স বের ক'রে আমার সামনে রেখে তিনি বললেন—আমায় মাপ করবেন। আপনাকে অবিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি, কিন্তু ভয়ে ভয়ে এমনি হয়ে গেছি!

মহিলাটিকে কামরার আলোয় এতক্ষণে ভালো ক'রে দেখলাম। চেহারায় তার স্পষ্ট বড় ঘরের ছাপ, কিন্তু কথাবার্তা ধরন-ধারণ যেমন

তার অদ্ভুত, তেমনি তাঁর পোশাক! যাই হোক, তখন সে-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয় তাঁর। কি আছে ওতে?

তিনি কথা না বলে শুধু বাক্সের ভেতর কুণ্ডলী পাকান এক-রাশ সাপের চোখ যেন জ্বলে উঠল। চমকে গেলাম। সাপ নয়—হীরা মুক্তোর জড়োয়া গয়না। তেমন গয়না আমি তো কখনো দেখি নি।

মহিলাটি মুঠো ক'রে কয়েকটা গয়না বাক্স থেকে তুলে কামরার মেঝেয় ছড়িয়ে দিলেন। আমি নিজের অনিচ্ছাতেই একটু শিউরে সরে বসলাম। সেগুলো যেন জড় বস্তু নয়, ক্রূর সরীসৃপ।

দরজায় খুট ক'রে একটু শব্দ হতে মুখ তুলে দেখি চরণ, কখন সেখানে নিঃশব্দে ছায়ার মতো এসে দাঁড়িয়েছে। তার কোটরে ঢোকা চোখেও যেন সাপের মতো হিংস্র লোভের ঝিলিক!

পলক ফেলতে না ফেলতেই সে সরে গেল। ভয় পেয়ে একটু বিরক্তির স্বরে বললাম—তুলে ফেলুন এসব বাক্সে। এসব সাংঘাতিক জিনিস নিয়ে আপনি কি বলে এই রাতে একা বেরিয়েছেন।

আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে গয়নাগুলি বাক্সে তুলতে তুলতে তিনি বললেন—বেরুব না? ওরা যে এসব ছিনিয়ে নিতে চায়।

ওরা কারা!

আমার শ্বশুর বাড়ির জ্ঞাতিরা। আমার স্বামী বিদেশে। ওদের এখন এই গয়না গুলোর ওপর অসীম লোভ। ওরা সব করতে পারে এগুলোর জন্যে—খুন করতে পারে। কিন্তু আমি দেব না, কিছুতেই দেব না। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাই আমি পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়?

যাব বাপের বাড়ি। ওরা আমায় দিন রাত আগলে রাখে, যেতে দেয় না। দোহাই আপনার! দু'ক্রোশ মাত্র গেলে আমার বাপের বাড়ি আমায় সেখানে পৌঁছে দিন।

আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি ব্যবস্থা করছি—বলে আমি কামরা থেকে চরণকে আদেশ দেওয়ার জন্যে বেরোলাম।

কিন্তু আশ্চর্য্য। চরণ যেন আগে থাকতেই সব জানে। সে হালে বসে আছে। নৌকা চলেছে।

বললাম—ক্রোশ-দুয়েক বাদে নৌকা থামিয়ে খবর নিও।

নিশ্চল ভাবে বসে কি যেন একটা অস্পষ্ট জবাব দিলে। অত্যন্ত বিশ্রী একটা অস্বস্তি নিয়ে আবার আমি কামরায় ঢুকে বসলাম—আমি বাইরে যাচ্ছি, আপনি এ কামরার ভেতর দরজা দিয়ে দিন।

তিনি ব্যাকুলভাবে বললেন—না না, সে আরো ভয় করবে। আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।

উত্তরে কিছু বলবার আগেই টলে গিয়ে চমকে উঠলাম। একি নৌকো হঠাৎ ঘুরে গেল কেন? চরণ মাঝি হাল ছেড়ে দিয়েছে নাকি। পান্‌সি নিজের খেয়ালে ঘুরছে!

টাল সামলে উঠেই বুঝলাম, আমার আশঙ্কা মিথ্যে নয়। ডুবে যাওয়া চাঁদের শেষ ক্ষীণ আলোয় দেখলাম, ঠিক যমদূতের মতো চরণ এসে কামরার দরজায় দাঁড়িয়েছে। কি হিংস্র লোভ তার অমানুষিক চোখে ও মুখে। বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় সেদিকে তাকালে।

অপরিচিতা মহিলা আতঙ্কে চিৎকার ক'রে বাক্স সজোরে বুকে আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে বেরিয়ে এলেন বুঝি আমার কাছে সাহায্যের আশায়। কিন্তু বৃথা। আমি বাধা দিতে যেতেই সবল হাতের একটি মুষ্টিতে মাথা ঘুরে সজোরে পড়ে গেলাম কাঠের মেঝের ওপর। মাথায় চোট খেয়ে তখন আমার কিরকম একটা আচ্ছন্ন—অভিভূত অবস্থা। চোখের সামনে যা ঘটছে, তা দেখতে পেলেও আমার যেন উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, গলায় স্বর পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে গেছে।

মহিলা প্রাণপণে তাঁর মহামূল্য বাক্সটি রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু স্ত্রীলোক হয়ে সে-দৈত্যের সঙ্গে তিনি পারবেন কি ক'রে।

ধীরে ধীরে বাক্সটি কায়দা ক'রে নিয়ে চরণ তাঁকে নৌকোর ধারে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তিনি টলছেন একেবারে জলের কিনারায়। দারুণ

হতাশায় শেষ শক্তি সংহত ক'রে তিনি প্রচণ্ড একটা টান দিয়ে বাক্স শুদ্ধ জলে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুশমনও।

এতক্ষণে একসঙ্গে গলার স্বর আর দেহের সাড়া পেয়ে আমি চিৎকার ক'রে ছুটে গেলাম পান্‌সির ধারে। মহামূল্য বোঝায় ভারি সেই বাক্সের টানে দু'জনেই তলিয়ে যাচ্ছে নদীর অতলে—কেউ তবু ছাড়বে না তার দখল।

সাঁতার জানি না, মহিলাটির সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়েও কিছু করতে পারব না। আমি আবার চিৎকার ক'রে উঠলাম। যদি কোথাও কেউ থাকে, তার সাহায্যের আশায়।

চাঁদ ডুবে গিয়ে ভোরের প্রথম নীলচে আলোয় তখন নদীর কুয়াশা তরল হয়ে যাচ্ছে। কটা ইলিশ মাছের ডিঙি বুঝি কাছেই ছিল। চিৎকার শুনে তারা কাছে এসে ভিড়ল। ব্যাকুলভাবে এক নিশ্বাসে তাদের যথা সম্ভব সমস্ত ঘটনা জানিয়ে যেখানে তাদের দু'জনে ডুবেছে, সে জায়গাটা দেখলাম।

তারা প্রথমে গম্ভীর হয়ে শুনে হেসে উঠল। হেসে জানাল যে, এ-রকম আজগুবি ব্যাপার হতেই পারে না যত ভারি জিনিসই হোক একেবারে গায়ে বাঁধা না থাকলে কাউকে একটানে ডুবিয়ে নিতে পারে না। তাও দু'-দুটো লোককে।, হাতে ধরে কাড়াকাড়ি করতে করতে ডুবলে দু'জন না হোক, একজন তো ভেসে উঠতোই। আর তা ছাড়া দু'ক্রোশ কেন এদিক-ওদিক বিশ ক্রোশের ভেতর প্রাসাদের মতো কোন পোড়ো বাড়িই নদীর ধারে নেই। দামী গয়নার বাক্স সমেত ও রকম মেয়েলোক আসবে কোথা থেকে।

আমি রেগে উঠে বললাম—তবে কি আমি মিথ্যে বলছি?

বৃদ্ধগোছের একটি মাঝি একটা ডিঙির এক কোণে বসে এতক্ষণ নীরবে তামাক খেতে খেতে আমার কথা শুনছিল। তারা কিছু বলবার আগেই সে এগিয়ে এসে শান্তস্বরে বললে—না বাবু, আপনি মিথ্যে বলেন নি, আমি জানি আপনি জঙ্গল-বাড়ির বৌরাণীকে দেখেছেন।

তার সমর্থনে একটু ভরসা পেয়ে বললাম—জঙ্গল-বাড়ির বৌরাণী। তুমি জান তাহলে। কোথায় জঙ্গল-বাড়ি বলো তো?

খানিক চুপ ক'রে থেকে নিচে জলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে হঠাৎ বললে—ওইখানে বাবু! আজ পঞ্চাশ বছর হলো জঙ্গল বাড়িকে নদী টেনে নিয়েছে। তবে বৌরাণী তাঁর জ্বালা ভোলেন নি। এখনো মাঝে মাঝে কারো পান্‌সিতে এসে ওঠেন।

জেলেরাই আমার পান্‌সি তারপর তীরে পৌঁছে দেয়। মাঝি-মাল্লারা যাত্রা থেকে ফিরে ব্যাকুল হয়ে তখন আমায় খুঁজছে। তাদের কাছে জানলাম, চরণ মাঝি তাদের সঙ্গেই ছিল সারারাত যাত্রার আসরে।

বুঝলাম, সব না হয় স্বপ্ন: কিন্তু আমার পান্‌সির নোঙর কে তুললে?

পান্‌সির ভাড়া চুকিয়ে পরের দিনই কলকাতায় ফিরেছি। কাজ নেই আমার আর পান্‌সি-বিহারে। আমি 'ছিন্নপত্র'ই পড়ব।

দশ নম্বর বাড়ীর রহস্য

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

দিব্যি একটা খালি বাড়ী পেয়ে গেলাম আলিপুরে! হার্ট ট্রাবলের জন্য ডাক্তার বলে দিল হাওয়া বদলাতে, বলে দিল—'কলকাতা ছেড়ে ঘুরে এসো গে কোথাও দিন কতক বাঁচতে চাও যদি। তবে যদি না বাঁচতে চাও সে কথা আলাদা।'

বাঁচতে কে না চায়? কাজেই ছাড়তে হলো কলকাতা। চলে এলাম আলিপুরে।

হ্যাঁ হাওয়া বদলাতে চাও তো আলিপুর, ঘণ্টায় ঘণ্টায় হাওয়া বদল হচ্ছে সেখানে। এমনকি মিনিটে মিনিটেও বলা যায়। আর তার রেকর্ড থেকে যাচ্ছে রীতিমত, আবহাওয়া আপিসটা সেখানেই কিনা!

উঠেছি এসে এখানে—আজ সকালেই। বিনি আর আমি। আমার উপর হাওয়া বদলের দায়, আর বিনির দায় খাওয়া বদলের। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সে আমাকে খাওয়াবে—পুষ্টিকর আর তুষ্টিকর যতো রকমের খাবার আছে। খাওয়াবার ভার তার ওপর, সে ভার বইবে ও। আর খাদ্যের ভার যা কিছু আছে সব বোঝা সইতে হবে, আমায়—হয়তো একটু কষ্ট করেই এই রকমের বোঝাপড়া।

তা কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলেনা—এখানে অবিশ্যি কেষ্টকে না পাবার জন্যেই এই কষ্ট করা। কেষ্ট প্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টির জন্যেই না এই খাদ্য বৃষ্টি? তা হোক্, যতই কষ্টদায়ক হোক্—কেষ্ট আর খাদ্যের মধ্যে বাছ বিচার করতে হলে খাদ্যকেই আমি বেছে নেব অম্লান বদনে, এমনকি; শ্রীমতি বিনির রান্না হলেও।

এক ঘণ্টাও হয়নি আমার। ইতিমধ্যে আসরে খাদ্য এসে হাজির। এক বাটি দুধ আর একখানা খাম বিনি আমার টেবিলে এনে রাখলে।

— তোমার চিঠি দাদা—দুধটা খেয়ে ফেল দেখি।

আমি আগে চিঠিখানা দেখি, এখনো তো কাউকে এখানকার ঠিকানা জানাইনি। আসতে না আসতেই তবে চিঠি আসে কি করে? কিন্তু না সত্যিই। এই ঠিকানারই চিঠি বটে। ওইতো লেখাই রয়েছে লেফাফার উপরেই ১০নং আলিপুর টেরেস। কিন্তু এর মধ্যেই আলিপুরের আমাদের ট্রেস পেলো কি ক'রে আমাদের শত্রু মিত্ররা? খাম খুলতে খুলতে কেমন একটা চকচকে আওয়াজ পেলাম। খামটা চকচকে বটে, কিন্তু তা বলে যতই চাকচিক্য থাক, তার থেকে চক চক শব্দ কেউ আশা করে না। তা বরদাস্তও করা যায় না কখনোই। খাম-টামের অতো অহঙ্কার থাকা ভালো নয়।

'শ্রীযুক্ত নতুন প্রতিবেশী সমীপেষু –

যুতসই ভণিতা দেখেই চট করে চিঠির শেষে চোখ বুলোতে গেলাম—কোন্ মহাত্মনের লেখা দেখা যাক। না, নাম ধাম নেই কারো। বিলকুল একখানা চিঠি।

প্রতিবেশীর প্রতি বেশী রকম ভালোবাসা থাকে না সকলের, থাকবার কথাও নয় তা মানি, কিন্তু তা বলে, সে আসতে না আসতেই তার প্রতি এইরূপ বেনামা ছুঁড়ে মারা, এই বা কি রকমের ভদ্রতা? অ্যাঁ?

…শ্রীযুক্ত নতুন প্রতিবেশী সমীপেষু, সবিনয় নিবেদন মহাশয়, আপনি আমাদের নতুন প্রতিবেশী…

জানি মহাশয়, জানি—কিন্তু দুঃসংবাদ অমন বার বার বেশী বেশী করে মনে করিয়ে দেবার মানে কি বলুন তো? আসতে না আসতেই চান কি যে এখান থেকেই আমরা উঠে যাই?

চিঠিখানা রেখে দুধ খেতে যাই। দেখি বাটি ফাঁকা। অজান্তে কখন খেয়ে বসে আছি। যাক বাঁচা গেল। দুধের মত একটা অখাদ্য যে অন্য জনে খেতে পেরেছে সেটা আমার সৌভাগ্যই।

কিন্তু যাব বোন আছে, বিনির মত বোন আছে তার সৌভাগ্য বলে কিছু নেই। তাব ইচ্ছে বনবাস। আবেক বাটি দুধ হাতে সে হাজির, আবাব সাথে এক প্লেট হালুয়া !

—আবে এই তো খেলাম বে, আবার এখুনিই ? আমি আপত্তি কবি। এই ঘন ঘন পথ্যি করলে কি মানুষ বাঁচে ? বিশেষ হার্ট যাদের খুব উইক ? তাতে ট্রাবলস, সাবে যদিও তাব, শেষটায় হয়তো পেটের ট্রাবলেই সে মারা যায়।

—কিন্তু ডাক্তার বলেছে না ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াতে ?

—তোব এর মধ্যেই এক ঘণ্টা হয়ে গেল।

তাক লাগে আমার। আলিপুরে আবহাওয়া মিনিটে মিনিটে বদলায় বলে শুনেছি বটে। কিন্তু তা বলে ঘণ্টারা কিছু আবহাওয়ার মতই বদলাতে পারে না! তাদের বদলাতে পাক্কা ষাট মিনিট লাগে, যেমন লাগতো কলকাতায়। অবশ্যি সময়তত্ত্বে আমি বিশেষজ্ঞ নই ঘড়ি দর্শনেও পোক্ত নই তেমন, তা ঠিক, কিন্তু তাহলেও আমাব ক্ষুদ্র বুদ্ধির যদ্দুব ধারণা এক একজামিনেশনের হল ছাড়া আর কোথাও পনের মিনিটে ঘণ্টা কাবার কখনো হয় না।

তবে কিনা, এখানেও তো আমি একটা পরীক্ষার সম্মুখীন। জীবন-মরণই পরীক্ষা। আর সেই জন্যেই যদি—। সেজন্যেই কিনা বিনির কাছে আমি জানতে চাই। বিনির জবাবে যা পাওয়া গেল, তা হচ্ছে এই—ডাক্তারের উপদেশ যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়, তাহলে দিনে রাতে চব্বিশবার খাওয়াতে হয় আমায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বার ঘণ্টাই নাকি আমি নাক ডাকাই। আর নাক থেকে হলে—'নাক থেকে নয় ঘুম থেকে'—আমি আবার ভুল শুধরে দিই—যাক সেই নাকামো থেকে তুলে আমাকে কিছু গেলানোব

মত দুঃসাধ্য কাজ আর দুটি নেই। আর তা নাকি ওর কম্মো না। তা ছাড়া রাত বিরেতে সেও নাকি একটু ঘুমোতে চায়। ঘুম পেলেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। সে—ও। আর আমার মত অতোটা না হলেও, ঘুমোতে একটু ভালোই বাসে। তার ঘুমোনোর সময়ে আমাকে তুলেই বা কে আর খাওয়ায় বা কে ? তাকে তুলে খাওয়ানোর জন্যেই মানে, তাকে নয় আমাকে খাওয়ানোর জন্যেই।

এই সব ভেবে চিন্তে সে ঠিক করেছে যতোক্ষণ আমি জেগে থাকি তার মধ্যেই উঠে প'ড়ে যেমন করে হোক বার চব্বিশেক আমাকে খাইয়ে দেবে। এবং সেই মহাচেষ্টাতেই এই····

'খাওয়াও'। হাল ছেড়ে দিয়ে আমি বলি—'খাইয়ে যাও। পড়েছি মোঘলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। দুধের বাটিটা রেখে হালুয়ার প্লেটটা হাতে নিই। চামচেয় করে মুখে তুলে এক একটু চাখি। চাখতে চাখতে আবার শুনি সেই চকচকানো ধ্বনি। আমার খারাপ লাগে এবার। এই কালো ভূতের মতন হালুয়া কোনোই চাকচিক্য নেই এর কোন খানেই মুখে তুলতে না তুলতেই এও যদি চকচকে আওয়াজ ছাড়ে তো গা জ্বালা না ক'রে পারে না। এমন বিচ্ছিরি হালুয়ার মুখে এমন চোকা চোকা বুলি—বড্ডোই বাড়াবাড়ি, নিতান্তই আদিখ্যেতা।

কিন্তু না, প্লেটে নয় দুধের বাটিতেই সেই চক্কার টেবিলের ওপরে শুধু সেই বাটিটা তার সীমানায় কেউ নেই। এক সীমান্তে কেবল আমি। আর সেই বাটির সম্মুখেই অদ্ভুত উক্ত আওয়াজ চক্‌চক্ করে যেন দুগ্ধ পান করছে। হক্‌চকানো ব্যাপার। বেশ করে রগড়ে খালি চোখে তাকালাম ভাল করে—টেবিলে শুধু সেই দুধের বাটিটা, কেউ নেই কিছু নেই তার কাছাকাছি—খালি সেই বাটিটা। দেখতে না দেখতে বাটিটা খালি হয়ে গেল।

অবাক কাণ্ড। বুক জ্বর জ্বর করতে লাগল। হার্ট ট্রাবল বাড়তে লাগলো নিজের থেকেই। অ্যাঁ এ আবার কি গো, এক চকরবরতির সামনে এ আবার কোন চকরবর্তী ? কোন চক্রান্ত কর্তা ? তখনই

মনে পড়লো ব্যাপারটা খুব অশ্রুতপূর্ব না একটু আগেই এমনি চক্‌চক্‌কাব যেন আবেকবার শুনেছি। আগের বাটিটাও তাহলে···এমনি নিজগুণেই? তবে কি আমি নিজে ফাঁক করিনি সেটাকে?

বিনি! বিনি! বিনি—। আমার আর্তনাদ ফোটে। আমাব চীৎকাবে সে ছুটে আসে—কি হয়েছে, কি হয়েছে দাদা?

কী আবাব হবে ঐ ছ্যাখ। আমি দেখাই। অদৃশ্য কিন্তু অশ্রুত মনকে দেখাতে যাই। দেখাতে গিয়ে অন্য দৃশ্য দেয় এবার। ঘরের কোণে কতকগুলি অগ্নি শলাকা ছুটাছুটি কবছে দেখতে পাই।

ওমা একি··। বিনি গালে হাত দেয়। সে অবাক। আর আমি? আমি ত হতবাক তাব আগেই। খানিক বাদে ওর কথাব জবাব দিতে গিয়ে নিজের গোঙানি আমাব কানে আসে।

ভূতুড়ে বাড়ি নাকি দাদা!

—কে জানে দিদি। বলতে গেছি একথাটাই। কিন্তু সমস্ত বাক্যটা প্লুতস্বর হয়ে বেবিয়ে আসে এক কথায় গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ ··· আমি বলতে থাকি। আপ্লুত হয়ে।

তোমার গোঁয়ার তুমি থামাও তো। বলে বিনি এক জালা ঠাণ্ডা জল এনে আমার মাথার উপর ঢেলে ছ্যায়। এই সব কাণ্ডেই ভড়কে গিয়েই কিনা কে জানে! জ্বলন্ত ফলকগুলি ঘরময় ছুটো পাটি লাগিয়ে দেয়। ততক্ষণে আমার সম্বিৎ ফিরে এসেছে।—

—বোল বলতে কি বহ্নি বলতে আমাদের বাড়িতে তুই-ই ছিলি এক মাত্র। এক মাত্রই বল আর এক মাত্রায় বল···আমি বলি কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এ বাড়ীতে তোর প্রতিদ্বন্দ্বিনী আছে। অনেক আছে। মানে এটা ভূতুড়ে বাড়ী নয়। ঐ বহ্নি শিখারা ভূত নয় কখনোই। পেত্নী।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পেত্নী বলা হচ্ছে আমায়? বটে? বুঝতে পারছি এখনও তোমার জ্ঞান সঞ্চার হয়নি ঠিক মতন। দাঁড়াও। বলে সে

আরেক বালতি জল আনতে যায়—ভাল করে আমার চৈতন্য সম্পাদনের মতলবেই।

যাবার মুখেই অযাচিত কার ল্যাজে যেন পা পড়ে যায় ওর আর সে (বিনি নয়। সেই অদৃশ্য লাঙ্গুলধারী) ম্যাও-ও বলে চেঁচিয়ে ওঠে। মাগো বলে একলাফে সে চার পা পিছিয়ে আসে।

আর চতুর্থ বারে আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে!

জীবটি অদৃশ্য হলে কি হবে তার আওয়াজ বেশ সুশ্রাব্য—সুখ-শ্রাব্যই। আর বিনির পায়ে তার আঁচড়ানি একবারেই অদৃশ্য নয়। সুদৃশ্যই বলতে হয়। তারপর আইডিন লাগাবার পর সেই পায়ের বাহার যা খোলে। দেখবার মতোই।

—বেড়ালের ভূত। —বিনি বলে।

— উঁহু। ভূতুড়ে বেড়াল। আমি তার ভ্রম সংশোধন করি। মাগো বেড়াল মরে ভূত হয় জানতুম না সাত জন্মে আঁচড়িত আইডিন-চর্চিত শ্রীচরণে সে হাত বুলোয়। —আবার ম'রে ভূত হবার পরেও এমন বেঁচে জলজ্যান্ত থাকে তা কে জানতো।

বেড়ালের ভূত মানুষের কোন ক্ষতি করে না। করতে পারে না। বরং ভেবে দেখলে—আমি ভেবে দেখি মানুষের উপকারেই লাগে। মনে কর তুই যেমন ঘণ্টায় চার বার করে আমায় দুধ গেলাবার জন্য কোমর বেঁধেছিস, তাতে ঐ ভূতুড়ে বেড়ালটা এখানে না থাকলে আমার কি দশা হতো? আমি কি বাঁচতাম? ওর সাহায্য না পেলে কি—

—তোমার আদরের বেড়াল নিয়ে তুমি থাকো। আমার বোনার কাজ ফেলে এসেছি—বলে আমার আদুরে বিবি ব্যাজার মুখে চলে যায়।

এবার আমি চিঠিখানা নিয়ে পড়ি—

মহাশয়, আপনি আমাদের নতুন প্রতিবেশী। ঐ দশ নম্বর বাড়ীর রহস্য হয়ত আপনার জানা নাই। সেই জন্যই আপনাকে সমস্ত জানাবার প্রয়োজন বোধ করছি।

হ্যাঁ খুলেই বলি সব—যে বাড়ীতে আপনারা এসে উঠেছেন, বছর দুই আগে আমরাই সেখানে থাকতাম। কিন্তু যে কারণে ঐ বাড়ী—অমন চমৎকার বাড়ী—আমাদের ছাড়তে হোল সেই কথাই বলছি।

মাঝের যে ঘরটায় এখন আপনি এসে আছেন ওইটায় আমার শোবার ঘর আর তাঁর ল্যাবরেটারী। আমার কাকা একজন পাস করা বৈজ্ঞানিক! নাম করলেই টের পাবেন বলে এর বেশী আর জানালাম না। ঐ ল্যাবরেটারীতে বসে তিনি নানা রকমের গবেষণা করতেন। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতো তার ঐখানেই। এমনি করতে করতে হঠাৎ একদিন তিনি অদৃশ্য হওয়ার উপায় আবিষ্কার করে বসলেন। পরীক্ষায় লাগানোর কাজে কতগুলো বিলাতী ইঁদুর তিনি আনিয়েছিলেন।

ইঁদুরগুলো সাহেবদেরই মতো শাদা! সেই শ্বেতকায়দের নিয়েই তাঁর যতো পরীক্ষা চলতো। সেদিনের কথা এখনো আমার স্মরণে আছে। "হাঁকা হাঁকি করে তিনি ডাকতে লাগলেন সবাইকে। সবাই আমরা ছুটে গেলাম—তার গবেষণা ঘরে। তিনি বল্লেন দ্যাখ। কি হয়েছে দ্যাখ।"

সবাই আমরা চোখ প্যাঁট প্যাঁট করে তাকালাম। না, দেখবার কিছু নেই কোথাও- কিছু নেই।

দেখছিস না খাঁচাটা? চেয়ে দ্যাখ্ ভালো করে। বলে তার সাহেবী ইঁদুরের খাঁচাটা দেখালেন। দেখলাম, যে খাঁচাটায় তার ইঁদুর সাহেবরা থাকত সেটা বিলকুল ফাঁকা, কোথায় গেল ইঁদুরগুলো? জিগ্যেস করলাম আমরা।

—আছেরে। ওইখানেই আছে। ওর মধ্যেই রয়েছে।—গর্বের হাসি হাসলেন কাকা · অদৃশ্য হয়ে রয়েছে সবাই।

আমার কাকা ভারি চালাক লোক। অদৃশ্য হয়ে যাবার পর পাছে ভগবানের মতোই তাদের অস্তিত্বে কেউ অবিশ্বাস করে সেই জন্যে আগের থেকেই তাদের গায়ে জ্বলজ্বলে কোন জিনিস লাগিয়ে

দিয়েছিলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখলুম সত্যিই তো। কতক গুলো উজ্জ্বল আলোকবিন্দু খাঁচার ভিতর ঝলমল করছে। জাজ্বল্যমান একপাল তিড়িং তিড়িং।

সবাই আমরা খাঁচার চারধার ঘিরে দাঁড়ালাম। আমাদের দেখে সেই আলোর কণাগুলি এমন লাফঝাফ লাগালো যে বলবার নয়। সেই উত্তেজনার মুহূর্তে একজন আমাদের খাঁচার দরজা খুলে দিলো একবার—কী মজা হয় দেখবার জন্যে, তারপর আর দেখতে হলো না। দেখতে না দেখতে জ্বলন্ত ফোঁটাগুলি বেরিয়ে পড়লো খাঁচা থেকে—ছিটকে পড়লো। ছিটকে পড়লো চারধারে—ছোটাছুটি লাগিয়ে দিল ঘরময়।

কাকা তখনি আমাদের তাঁর ঘর থেকে বার করে দিয়ে খিল এঁটে দিলেন। তিনি খুব চটে গিয়েছিলেন আমাদের এই কাণ্ডে—এই অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিতে, তা বলাই বাহুল্য। তারপর কি হলো শুনুন তার দিনকতক বাদে। যখন সেই অদৃশ্য ইঁদুরের কথা আমরা ভুলে গেছি। কাকার আবিষ্কার কাহিনী আর আমাদের মনে নেই, খেতে বসেছি আমরা সবাই গোল ঘরটায়। কাকীমা পরিবেশন করছেন। এমন সময়ে কাকীমার আদরের মেনি বেড়ালটা বেড়িয়ে ফিরলো বাহির থেকে। এসে জমলো আমাদের পাতের গোড়ায়। বসে খালি সে মুখ মুছতে লাগলো নিজের। মুখের ভাব ভারী হাসি খুশী। কোথা থেকে তিনি যে বেশ কিছু সাঁটিয়ে এসেছেন তা বুঝতে পারা শক্ত নয়।

তারপর কি বলবো মশাই—বসেছিলো বেড়ালটা আমাদের সবার চোখের সামনেই। চোখের ওপরেই সেটা কেমন ছায়ার মত ঘোলাটে হয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে সেই ছায়া মূর্তি ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল একবারে। দেবতারা যেমন অন্তর্হিত হন ঠিক সেই মতন।

আমরা খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম।

কাকাবাবু খেয়ে দেয়ে ঝিমুচ্ছিলেন তাঁর বেতের চেয়ারে। আমরা

ছুটে গিয়ে ঘটনাটা তাঁকে জানালাম—তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে। কিন্তু বিশদ করে সব বোঝাবার আগেই তিনি লাফিয়ে উঠেছেন, তার সযত্ন সমুজ্জ্বল লাঙুলের কতোখানি কোন অদৃশ্য জীবের তাড়নায় তাঁর কোলে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো আচমকা। তিনি তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টেবিলের উপর উঠে দাঁড়ালেন একলাফে। কাকীমার বেজায় আদরের ছিল বেড়ালটা, তার অন্তর্ধানে তার প্রাণে কিরকম ব্যথা লেগেছিল অনুমান করতে পারবেন। নামজাদা বিজ্ঞানীর বৌ হলে কী হবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যাকে বলে তা তার আদপেই ছিল না! বেড়ালের তিরোধানে মর্মাহত হয়ে কাকাবাবুকেই তার জন্য দায়ী করে তার সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না বলেই কাকীমার বুদ্ধি ছিল একটু বেশী। একদিন তিনি করলেন কি একটা বড় জামবাটিতে দুধ ভর্তি করে রেখে দিলেন ঘরের মেঝেয় আর আমাদের সবাইকে বলে দিলেন ম্যাও ম্যাও করে বেশ মৌজ করে গলা সাধতে।

আমরা সাধ্যমত সুর করছি। আমাদের সাধাসাধিতেই কিনা বলা যায় না। দেখলেই বাটির দুধ কমে আসছে—কমতে সুরু করেছে ক্রমেই। আমাদের সুরধুনি নামতেই না, বেড়ালটা তার অদৃশ্য গোঁফ :বয়েছে দুধ পাথারে। দুধের সেই কমতির মুখে, কাকীমা করলেন কি—সুকৌশলে তার পুষিকে পাকড়ে ফেললেন। তাকে ধরে না তার গলায় একটি লাল রঙের রুমাল বেঁধে দিলেন কায়দা করে!

তারপর থেকেই যতো অদ্ভুত কাণ্ড আরম্ভ হোল আমাদের বাড়ী নিত্য নতুন মজা। কোথাও কিছু নেই। বাড়ীময় একটা লাল রুমাল ঘুর ঘুর করছে—লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে চারধারে। কখনো বা দেখা যেত কতগুলি অগ্নিবিন্দু হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে আর তাদের পিছু পিছু তাড়া করে চলেছে উদ্যত এক লাল ঝাণ্ডা। যাক দেখতে দেখতে সব আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেল।

তারপর এলো আরেক উৎপাত—তার কিছুদিন পরেই। মনে হোল অগ্নিপুচ্ছদের সংখ্যা ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে—এদিকে পুষির বংশবৃদ্ধিরও খবর পেলাম আমরা প্রচুর কচিগলায় মিশানো মিঠে আওয়াজেই তা জানা গেল। চারধার থেকেই অদৃশ্য কণ্ঠের অবিশ্রান্ত মিউমিউ শুনে আর অফুরন্ত আলোর ঝিলমিল দেখে সবাই আমরা কেমন মিইয়ে গেলাম—এমন কি আমাদের বৈজ্ঞানিক কাকাবাবুও। কুরুবংশ আর পাণ্ডুবংশ—দুই পক্ষেই বাড়তে লাগল মা-ষষ্ঠীর আশীর্বাদে। আর সেই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে বাস করা আমাদের নিতান্তই কঠিন হয়ে উঠল। আমরা পাততাড়ি গুটোতে বাধ্য হলাম তারপর।

সেই থেকে ও বাড়ী খালি পড়ে ছিলো অ্যাদ্দিন। এখন আপনারা এসেছেন! যাই হোক আপনারা যেন ঘাবড়াবেন না যদি আপনার আনাচে কানাচে অগ্নিশিখাদের নড়ে চড়ে বেড়াতে দেখেন, যদি কখনো বা হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখতে পান্ বা কোন অলক্ষিত নখরের লক্ষ্য হন জানবেন সেটা বিজ্ঞানের জয়স্তম্ভ। আমাদের কাকাবাবুর দান। তার সৃষ্টির আনন্দ—বৈজ্ঞানিক খুশি। আর কাকীমার পুষির বংশ বিস্তার। তার জন্য ভয় পাবেন না যেন। অদ্ভুত হলেও ভূত নয় ওসব। বেড়ালের ভূতটুত না—শুধু সেই একটি বেড়ালই বেড়ে বেড়ে এখন প্রভূত হয়েছে। এইমাত্র। প্রীতি নমস্কার নিন।

ইতি আপনাদেরই এক অদূর প্রতিবেশী।

পুনশ্চ মাছ—আর দুধের পাত্র সব সময়েই ঢাকা দিয়ে রাখতে যেন ভুলবেন না।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বিনির ঘরে যাই! এ বাড়ীর ওখানকার বাড়াবাড়ির সব রস সমস্ত রহস্য আবিষ্কার করতে চাই তার কাছে। গিয়ে দেখি বিনি দেবী বেতের চেয়ারে বসে বেতসের মতই কাঁপছেন—তার দুচোখ ভয়ে বিস্ফারিত। আর তার আধ-বোনা ব্লাউজখানা পড়ে আছে এক ধারে একান্ত অবহেলায়। এবং তার উলের গুলতি নিয়ে—

গুলতি নিয়ে সাত দিক থেকে সাতটি অদৃশ্য খেলোয়াড় ফুটবল

খেলতে লেগেছে দেখলাম। তারপর আর রহস্য বিস্তার করেও কোন ফল হল না। বিজ্ঞানের মহিমা ফলাও কারেও নয়—বিনি সেইদিনই সেইদণ্ডেই—আমাকে নিয়ে চলে এলো সেখান থেকে। চলে এলাম আমাদের পুরানো বাড়ীতে—আমার পুরাতন হার্ট ট্রাবলে। সে বললে, শুধু একটা কথায় বললে, হ্যা মানি এটা বিজ্ঞানের যুগ। কিন্তু তা বিজ্ঞানের সব দান আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে, এমন কি তা অ্যাটম বোমা হলেও একথা আমি মানতে রাজি নই।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ভালো, খুবই ভালো, কিন্তু তার কাছাকাছি বাস করা কোনো মতেই ভালো নয়।

●

কামিনী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টেশনে ট্রেন থামিতেই হ্যাট-কোট পরা সুরনাথবাবু নামিয়া পড়িলেন। স্টেশনটি ছোট, তাহার সংলগ্ন জনপদটিও বিস্তীর্ণ নয়. ট্রেন দু'মিনিট থামিয়া চলিয়া গেল।

সুরনাথ ঘোষ একজন পোষ্টাল ইন্সপেক্টর। সম্প্রতি এদিকটার গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি নূতন পোস্ট অফিস খুলিয়াছে, সুরনাথবাবু সেগুলি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে তিনি এদিকে কখনো আসেন নাই।

ছোট সুট্‌কেসটি হাতে লইয়া তিনি স্টেশনে বাহির হইলেন। সঙ্গে অন্য কোন লটবহর নাই। সুট্‌কেসের মধ্যে আছে এক সেট্ প্যাণ্টলুন ধুতি গামছা সাবান, দাঁত মাজিবার বুরুশ ইত্যাদি।

স্থানীয় পোষ্ট অফিসটি স্টেশনের কাছেই। ডাক এবং তার দুই-ই আছে, কিন্তু সবই শহরের অনুপাতে; একজন পোষ্টমাস্টার, একটি কেরানী ও দু'জন পিওন। পোষ্ট অফিসের পশ্চাদ্ভাগে পোষ্টমাস্টার সপরিবারে বাস করেন।

বেলা আন্দাজ এগারটার সময় সুরনাথবাবু পোষ্ট অফিসে আসিয়া নিজের পরিচয় দিলেন, পোষ্টমাস্টার খাতির করিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরে আহারাদির ব্যবস্থা পোষ্টমাস্টারবাবুর বাসাতেই হইল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সুরনাথবাবু ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিলেন। তারপর আবার ধড়াচূড়া পরিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে তিনি খবর লইয়াছেন, যে তিনটি পোষ্ট অফিস পরিদর্শনে

তিনি যাইবেন তাহার মধ্যে সবচেয়ে যেটি নিকটবর্তী সেটি বারো মাইল দূরে। কাঁচা-পাকা রাস্তা আছে। সুরনাথ 'তার' পিওনের সাইকেলটি ধার লইয়াছেন। আজ সন্ধ্যার সময় উদ্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছিবেন, কাল সকালে সেখানকার পোষ্ট অফিস তদারক করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিয়া আসিবেন, তারপর আবার অন্য পোষ্ট অফিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবেন।

সাইকেলের পশ্চাদ্ভাগে ছোট সুট্‌কেসটি বাঁধিয়া সুরনাথ তাহাতে আরোহণের উদ্যোগ কবিলে পোষ্টমাস্টার বলিলেন, 'এখান থেকে মাইল পাঁচ ছয় দূরে বাস্তা দু ফাঁক হয়ে গেছে। ডান হাতি রাস্তা দিয়ে গেলে একটু ঘুব পড়ে বটে, কিন্তু আপনি এই রাস্তা [illegible]

সুবনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, [illegible] করেছে?'

পোষ্টমাস্টার বলিলেন, 'ও রাস্তাটা ভাল নয়।'

সাইকেলে আরোহণ করিয়া সুরনাথ বাহির হইয়া পড়িলেন। কয়েক মিনিটেব মধ্যেই তিনি শহরেব এলাকা পার হইলেন। তারপর অবারিত মুক্ত দেশ।

দেশটা বর্ণসংকর। অবিমিশ্র পলিমাটি নয়, আবার নির্জল মরুকান্তারও নয়। স্থানে স্থানে ঘন বন আছে, কোথাও নিস্তরুপাদপ শিলাভূমি, কোথাও নরম মাটির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রুক্ষ পাথরের ঢিবি মাথা তুলিয়াছে। এই বিচিত্র ভূমিব উপর দিয়া নির্জন পথটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে।

আকাশে পৌষ মাসের স্নিগ্ধ সূর্য, বাতাসে আতপ্ত আরাম। সুরনাথ প্রফুল্ল মনে মন্থর গতিতে চলিয়াছেন। মাত্র বারো চৌদ্দ মাইল পথ সাইকেলে যাইতে কতই বা সময় লাগিবে!

সুরনাথের বয়স চল্লিশ বছর। মধ্যমাকৃতি দৃঢ় শরীর, মুখশ্রী মোটের উপর সুদর্শন। তিনি বিপত্নীক, বছর তিনেক আগে স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে। আবার বিবাহের প্রয়োজন তিনি মাঝে মাঝে

অনুভব করেন, কিন্তু বিপত্নীকত্বের ফলে যে ক্ষণিক স্বাধীনতাটুকু লাভ করিয়াছেন তাহা বিসর্জন দিতেও মন চাহিতেছে না।

তিনি যখন ছয় মাইল দূরস্থ পথের দ্বিভুজে পৌঁছিলেন তখন সূর্য পশ্চিম দিকে অনেকখানি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সম্মুখে দুইটি পথ ক্রমশ পৃথক হইতে হইতে ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে ; মাঝখানে উঁচু জমি তাহার উপর তাল খেজুরের গাছ মাথা তুলিয়া আছে।

হঠাৎ কোথা হইতে ক্ষুদ্র একখণ্ড কালো মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া দিল, চারিদিক অস্পষ্ট ছায়াছন্ন হইয়া গেল। সুরনাথ পথের সন্ধিস্থলে সাইকেল হইতে নামিলেন।

[illegible] আকাশ নির্মল, কেবল [illegible] হ, যেন সূর্য মুখোশ পরিয়াছে, সুরনাথ একটু চিন্তা করিলেন। এখনো ছয়-সাত মাইল পথ বাকি, আধঘণ্টার মধ্যেই সূর্য অস্ত যাইবে ; অন্ধকার হইবার পূর্বে যদি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে না পারেন, দিকভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

পোষ্টমাস্টার বলিয়াছেন বাঁ-হাতি রাস্তা ভাল নয়, কিন্তু দৈর্ঘ্যে ছোট। সুতরাং বাঁ হাতি রাস্তা দিয়া যাওয়াই ভালো।

সুরনাথ সাইকেলে বাঁ-হাতি রাস্তা ধরিলেন। পোষ্টমাস্টার মিথ্যে বলেন নাই, পথ অসমতল ও প্রস্তরাকীর্ণ, কিন্তু সাবধানে চলিলে আছাড় খাইবার ভয় নাই। সুরনাথ সাবধানে অথচ দ্রুত সাইকেল চালাইলেন।

সূর্যের মুখ হইতে মেঘ কিন্তু নড়িল না। মনে হইল মুখে মুখোশ আঁটিয়াই সূর্যদেব অস্ত যাইবেন।

মিনিট কুড়ি সাইকেল চালাইবার পর সুরনাথ সামনে একটি দৃশ্য দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিলেন। অস্পষ্ট আলোতে মনে হইল যেন রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট কুটির দেখা যাইতেছে, দু'একটা আবছায়া মূর্তিও যেন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

আরো কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর পাশের দিকে চোখ ফিরাইয়া

সুরনাথ ব্রেক্ করিলেন। একটি ছোট মাটির কুটির যেন মন্ত্রবলে রাস্তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আশে পাশে অন্য কোন কুটির দেখা যায় না; এই কুটিরটি যেন গ্রামে প্রবেশের মুখে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে।

সুরনাথ রাস্তার ধারে যেখানে সাইকেল হইতে নামিলেন সেখান হইতে তিন গজ দূরে কুটিরের দাওয়ায় খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া একটি যুবতী বসিয়া আছে। সুরনাথের চোখের সহিত তাহার চোখ চুম্বকের মত আবদ্ধ হইয়া গেল।

চাষার মেয়ে! গায়ের রং মাজা পিতলের মত পীতাভ, দেহ যৌবনের প্রাচুর্যে ফাটিয়া পড়িতেছে। মুখের ডৌল দৃঢ়, তাহাতে প্রগলভতার সমাবেশ। মাথার অযত্নবিন্যস্ত চুলের প্রান্তে একটু পিঙ্গলতার আভাস, চোখের তারা বড় বড়। পরিধানে কেবল একটি কস্তাপাড় সাড়ি, অলঙ্কার নাই। সধবা কি বিধবা কি কুমারী বোঝা যায় না। তার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন আগুন বাঙা চুল্লীর দিকে চাহিয়া আছি।

"হ্যাঁগা, তুমি কোথায় যাবে?" যুবতী প্রশ্ন করিল। দাঁতগুলি কুন্দশুভ্র, গলার স্বর গভীর ও ভরাট; কিন্তু কথা বলিবার ভঙ্গী গ্রাম্য।

সুরনাথের বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল। দীর্ঘকালের অনভ্যস্ত একটা অন্ধ আবেগের স্বাদ তিনি অনুভব করিলেন। কিন্তু তিনি লঘুচেতা লোক নন, সবলে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন—, 'রতনপুর'।

যুবতী দাওয়ার কিনারায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসিতে প্রগল্‌ভতা ছাড়াও এমন কিছু আছে যাহা পুরুষের স্নায়ুশিরায় আগুন ধরাইয়া দিতে পারে। শেষে হাসি থামাইয়া সে বলিল, 'রতনপুর যে অনেক দূর, যেতে যেতেই রাত হয়ে যাবে, পৌঁছতে পারব না।'

সুরনাথ রাস্তার দিকে চাহিলেন। দূর হইতে যে গ্রামের আভাস

পাইয়াছিলেন সন্ধ্যার ছায়ায় তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। তিনি উদ্বেগ স্বরে বলিলেন, 'তাহলে গ্রামে কি কোথাও থাকবার জায়গা আছে?'

'এখানেই থাকো না!'

সুরনাথ চকিত চক্ষে যুবতীর দিকে চাহিলেন। যুবতীর দৃষ্টিতে দুরন্ত আহ্বান, আরো কত রহস্যময় ইঙ্গিত। সুরনাথের বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। তিনি শরীর শক্ত করিয়া নিজেকে সংবরণ করিলেন, একটু স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'বাড়ির পুরুষেরা কোথায়?

যুবতী দূরের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল, 'তারা মাঠে গেছে, সারা রাত ধান পাহারা দেবে। মাঠে ধান পেকেছে, পাহারা না দিলে চোরে চুরি করে নিয়ে যাবে।'

সুরনাথ কণ্ঠের মধ্যে একটা সংকোচন অনুভব করিলেন, বলিলেন, 'তা—যদি অসুবিধা না হয়, এখানেই থাকব।'

যুবতী দশনচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া হাসিল, প্রায়ান্ধকারে তাহার হাসিটা তড়িদ্দীপালির মত ঝলকিয়া উঠিল। সে বলিল, 'তোমার গাড়ি দাওয়ায় তুলে রাখো। আমি আসছি।'

যুবতী ঘরে প্রবেশ করিল, একটি মাদুর আনিয়া দাওয়ার একপাশে পাতিয়া দিল। এক ঘটি জল ও গামছা খুঁটির পাশে রাখিয়া বলিল, 'হাত মুখ ধোও। চা খাবে তো? আমি এখনি তৈরী করে আনছি।'

যুবতী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। সুরনাথ হাত মুখ ধুইয়া মাদুরে বসিলেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। আলোর পীতবর্ণ ধারা দাওয়ার উপর আসিয়া পড়িল।

বাইরে নীরন্ধ্র অন্ধকার। চরাচর গ্রাস করিয়া লইয়াছে। সুরনাথ বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মানসিক অবস্থার বর্ণনা অনাবশ্যক। ব্যাধ শরাহত মৃগ, বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গের মানসিক অবস্থা কে কবে বিবৃত করিয়াছে!

'এই নাও, চা এনেছি!' চা দিতে গিয়া আঙুলে আঙুলে একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হইল—'আমি রান্না চড়াতে চললুম।'

সুরনাথ ক্ষীণস্বরে আপত্তি তুলিলেন, 'আমার জন্যে আবার রান্না কেন? ঘরে মুড়ি মুড়কি যদি কিছু থাকে, তাই খেয়ে শুয়ে থাকব।'

'ওমা মুড়ি মুড়কি খেয়ে কি শীতের রাত কাটে! রাতউপোসী হাতী টলে। তোমার অত লজ্জায় কাজ নেই, এক ঘণ্টার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে।'

যুবতী চলিয়া গেল। সুরনাথ চায়ের বাটিতে চুমুক দিলেন। পিতলের বাটিতে গুড়ের চা, কিন্তু খুব গরম। তাহাই ছোট ছোট চুমুক দিয়া পান করিতে করিতে তাঁহার শরীর বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সুরনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন কুটিরের মধ্যে দুটি ঘর একটি রান্না ঘর, অপরটি বোধ হয় শয়ন কক্ষ। তিনি অনুমান করিলেন দাওয়ায় মাদুরের উপর তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইবে। সেই ভাল হইবে। কোন মতে রাত কাটাইয়া ভোর হইতে না হইতে তিনি চলিয়া যাইবেন।

ঘণ্টাখানেক পরে যুবতী দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, 'ভাত বেড়েছি, খাবে এস।'

সুরনাথ উঠিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের ঠাণ্ডার তুলনায় ঘরটি বেশ আতপ্ত। পিঁড়ের সামনে ভাতের থালা, প্রদীপটি কাছে রাখা হইয়াছে। আয়োজন সামান্যই, ভাত ডাল এবং একটা চচ্চড়ি জাতীয় তরকারী।

সুরনাথ আহারে বসিলেন। যুবতী অতি সাধারণ গৃহস্থালির কথা বলিতে বলিতে ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুরনাথ লক্ষ্য করিলেন, রান্না করিতে করিতে যুবতী কখন পায়ে আলতা পরিয়াছে!

যুবতী সুরনাথ সঙ্গে সহজভাবে কথা বলিতেছে, অথচ তিনি হুঁ হাঁ ছাড়া কিছুই বলিতেছেন না। বিপদের সময় যে ডাকিয়া ঘরে

আশ্রয় দিয়াছে, খাইতে দিয়াছে, তাহার সহিত অন্তত একটু মিষ্টালাপ করিবার প্রয়োজন আছে। তিনি শামুকের মত খোলার ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া বলিলেন, 'তোমার নাম কি ?'

এক ঝলক হাসিয়া যুবতী বলিল, 'কামিনী'।

নামটা তপ্ত লোহার মত সুরনাথের গায়ে ছ্যাঁক করিয়া লাগিল। তিনি শামুকের মত আবার খোলার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আহারান্তে সুরনাথ হাত মুখ ধুইলে কামিনী বলিল, 'পাশের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছি, শুয়ে পড় গিয়ে।'

সুরনাথের বুক ধড়াস করিয়া উঠিল। তিনি তোতলা হইয়া গিয়া বলিলেন, 'আমি—আমি বাইরে মাদুরে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেব।'

কামিনী গালে হাত দিয়া বলিল, 'ওমা বাইরে শোবে কি ! শীতে কালিয়ে যাবে যে ! যাও বিছানায় শোও গিয়ে।'

সুরনাথ কথা কাটাকাটি করিলেন না, কামিনী রাত্রে কোথায় শুইবে প্রশ্ন করিলেন না, দণ্ডাজ্ঞাসবাহী আসামীর মত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঘরে দীপ জ্বলিতেছে। মেঝের উপর খড় পাতিয়া তাহার উপর তোশক বিছাইয়া শয্যা। সুরনাথ সুটকেস আনিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিলেন, তারপর প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়া শয়ন করিলেন।

চোখ বুজিয়া তিনি পাশের ঘরে খুট-খাট ঠুন-ঠান বাসন-কোশনের শব্দ শুনিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়গুলি অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনের উত্তাপ একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে বাহির হইয়া আসিল।

চোখ বুজিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর তিনি আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ চটকা ভাঙিয়া গেল। তিনি চোখ খুলিয়া দেখিলেন, কামিনী নিঃশব্দে কখন তাঁহার বিছানার পাশে আসিয়া বসিয়াছে ; তাহার মুখে বিচিত্র হিংস্র মধুর হাসি।

তিনি দিন পর্যন্ত সুবনাথ যখন ফিরিয়া আসিলেন না তখন পোষ্ট-মাস্টারবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন ! কেবল সুরনাথবাবুর জন্যে নয়, সেই সঙ্গে পোষ্টঅফিসের সম্পত্তি সাইকেলটিও গিয়াছে। পোষ্টমাস্টার পুলিশে খবর দিলেন।

পুলিশ খোঁজ লইল। সুবনাথের যে তিনটি পোষ্ট অফিসে যাইবার কথা সেখানে তিনি যান নাই। পুলিশ তখন রীতিমত তদন্ত আরম্ভ করিল।

সাতদিন পরে সুরনাথকে পাওয়া গেল। বাঁ-হাতি রাস্তায় একটিও কুটির নাই, সেই রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে তাহার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। সাইকেলটা অনতিদূরে মাটিতে লুটাইতেছে। তাহার পশ্চাতে সুবনাথের সুট্‌কেস রহিয়াছে, সুটকেসের মধ্যে কাপড়-চোপড় সাবান মাজন বুরুশ সমস্তই মজুত আছে ! কিছু খোয়া যায় নাই।

সুরনাথের দেহে কোথাও আঘাতচিহ্ন নাই। কিন্তু দেহটি প্রাচীন মিশরীয় 'মমির মত শুষ্ক ও অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে, যেন রক্ত-চোষা বাদুড় দেহটা শুষিয়া লইয়াছে।

পুলিশ হাসপাতালে লাশ চালান দিল। পোষ্টমাস্টার যখন সুবনাথের মৃত্যু-বিবরণ শুনিলেন, তখন তিনি আক্ষেপে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'আহা ! ডাইনীর হাতে পড়েছিলেন ! কামিনী ডাইনী এখনো তল্লাটে আছে, মায়া বিস্তার করে বেচারিকে টেনে নিয়েছিল। আমি ইন্সপেক্টরবাবুকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, বাঁ-হাতি রাস্তা ভাল নয়। কিন্তু উনি তা শুনলেন না।'